কৃষক মাঠস্কুলের মাধ্যমে চাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনমানের উন্নয়ন

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান
এস. এম. নূরুন নবী
আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন বরিশাল কম্পোনেন্ট

বাংলাদেশে খাল, বিল, নদী, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি আকারে বিপুল পরিমাণ উন্মুক্ত জলরাশি (প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর) রয়েছে যেখানে প্রায় ২৬০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় (Rahman 1989)। এইসব জলরাশি থেকে প্রায় ৮০% গ্রামীণ জনগণ মাছ ধরে তাদের প্রোটিনের ৬০% চাহিদা পূরণ করে (BBS 1997) এবং জেলে সম্প্রদায় মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও এই জলাশয় থেকে বিপুল পরিমাণ ছোট মাছ আহরণ করা হয়, যদিও তা পরিসংখ্যানে ধরা হয় না। এগুলো গরিব জনগণের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে, প্রোটিনের চাহিদা পূরণে এবং জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (Thompsen et al. 1999)। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন রাস্তাঘাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে, পলি জমে জলাশয়ের নাব্যতা হ্রাস এবং সর্বোপরি মৎস্য সংরক্ষণ আইন অমান্য করে অত্যধিক হারে মাছ আহরণের মাধ্যমে মাছের বাসস্থান ধ্বংস করা হয়েছে (Hughes et al. 1994; Ali 1997)। ফলে বর্তমানে উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রতি ইউনিট চেষ্টাতে প্রাপ্ত মাছের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় ব্যাপক পরিমাণে কমে গেছে। সুতরাং বর্তমানে জেলেদের শুধু মাত্র মাছ ধরে জীবন যাপন করা কঠিন। উপরন্তু, বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন নদ-নদীতে এবং ১ এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা ধরা নিষিদ্ধ থাকায় জেলেদের জীবনযাপনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এ অবস্থায় জেলেদের জীবন মান উন্নয়নে নিম্নের বিকল্প পদ্ধতির সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে :

১. আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা যেমন- ক) উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ। খ) পেনে মাছ চাষ।
২. উন্মুক্ত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা।

১. আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড

ক) উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন- কুমিল্লা জেলার গজারিয়ায়, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চাঁদপুর এর কারিগরি সহায়তায় এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও চাঁদপুর পৌরসভার যৌথ অর্থায়নে নদীতে লাভজনকভাবে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষ করে চাষিরা তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্মুক্ত জলাশয়ে যেখানে বৎসরে ৬-৭ মাস পানি থাকে, সেখানেই খাঁচায় মাছ চাষ সম্ভব। বিশেষ করে বছরের যে সময় উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ থাকে সেই সময়ে খাঁচায় মাছ চাষ করে জেলেরা তাঁদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

চিত্র ১: চাঁদপুরে খাঁচায় মাছ চাষ।

খ) পেনে মাছ চাষ

এমন অনেক জলাশয় আছে যার দুই বা ততোধিক পাশ প্রাকৃতিকভাবে আবদ্ধ থাকে এবং খোলা প্রান্ত বাঁশের বা জালের ঘেরা দিয়ে সাফল্যজনকভাবে মাছ চাষ করা যায়। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষের উপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয় এবং দেখা যায় যে, সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষের ফলে অচাষকৃত মাছ ও ধানের উৎপাদন ব্যাহত না করে প্রতি বছরে প্রতি হেক্টরে ৬০০-১৫০০ কেজি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে (Prein et al. 2006)।

২. উন্মুক্ত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা

এই ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় জলমহলের/জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী সংগঠিত গরিব মৎস্যজীবী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং সকল শ্রেণীর জনগণের সমর্থনে একটি সুষ্ঠু এবং টেকসই ব্যবস্থাপনায় জলমহালে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এই ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো সংগঠিত মৎস্যজীবীদের মধ্যে আয়-ব্যয়ের সমবণ্টন নিশ্চিত করা, জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য বজায় রেখে টেকসইভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

এই সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে মৎস্য আইন মেনে চলা ও মাছ ধরা নিয়ন্ত্রিত করে, উন্মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন করা সম্ভব। বিশেষ করে অভয়াশ্রম তৈরি করে প্রাকৃতিক মৎস্যের ব্যবস্থাপনা করে উন্মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে জেলেরা টেকসইভাবে অধিক পরিমাণ মাছ ধরে বাড়তি আয়ের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নয়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় অভিজ্ঞতার আলোকে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৬ সালে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন-মৎস্য অধিদপ্তর, কারিতাস, প্রশিকা, ব্রাক, বাঁচতে শেখা, ক্রেড ও ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার (পূর্বে ইকলার্ম) সফলভাবে সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে ডানিডা সাহায্যপুষ্ট পটুয়াখালী-বরগুণা মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প ২০০২ সালে অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার সাথে মাঠপর্যায়ে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ শুরু করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন বরিশাল কম্পোনেন্ট (RFLD-BC) এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পের কর্ম এলাকায় বিভিন্ন জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ করে উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৫৪-১৫০ কেজি থেকে ৬০০-১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই জেলে সম্প্রদায় বা চাষি কীভাবে পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা করবে? এক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ এপ্রোচ হলো কৃষক মাঠ স্কুল (Farmers Field School)। কারণ প্রচলিত উপর নীচ এপ্রোচ এ কিছুটা কৃষির উন্নয়ন করা সম্ভব হলেও সার্বিকভাবে মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশেষায়িত বাণিজ্যিকভাবে সফল চাষি তৈরি করে টেকসই সম্প্রসারণের প্রয়োজন একটি অংশগ্রহণমূলক, মিথ-ষ্ক্রিয়াপূর্ণ ও উদ্ভাবনমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Asiabaka)।

কৃষক মাঠ স্কুল বলতে আমরা কী বুঝি? এই টার্মটি ইন্দোনেশিয়ার "Sekolah Lampangam" যার অর্থ হলো "মাঠস্কুল"। প্রথম মাঠস্কুল স্থাপিত হয় সেন্ট্রাল জাভায় FAO সাহায্যপুষ্ট জাতীয় আইপিএম প্রোগ্রামে (Berg 2004, Matata et al. 2001)। পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই এপ্রোচ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে কেয়ার, FAO এর বিভিন্ন প্রকল্পে এবং আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন বরিশাল কম্পোনেন্টে এই কৃষক মাঠ স্কুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃষক মাঠস্কুল হচ্ছে একটি মঞ্চ (platform) এবং অবকাঠামোহীন স্কুল যার মাধ্যমে চাষিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো ও টেকসই কৃষি কার্যক্রমের জন্য উদ্ভাবনের উদ্দীপনা দেয়া হয় (Khisa, 2004)। অন্য কথায়, কৃষক মাঠস্কুল হলো বয়স্ক শিক্ষার একটি ধরন যেখানে কৃষকেরা মাঠ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। এটা একটি অংশগ্রহণমূলক (participatory), উদ্ভাবনমূলক (innovative) ও মিথষ্ক্রিয়াপূর্ণ (interactive) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। কৃষক মাঠ স্কুলে একদল কৃষক (২০-২৫ জন) সারা মৌসুম নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে নতুন উৎপাদন কৌশল পরীক্ষণের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণ শেষ হলেও তাঁরা তা চলমান রাখে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো চাষিদের নিজস্ব ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জ্ঞান ও দক্ষতায় তাঁদের ক্ষমতায়ন করা। নিম্নে কৃষক মাঠ স্কুলের ধাপসমূহ দেয়া হলো (চিত্র ২ ও ৩)।

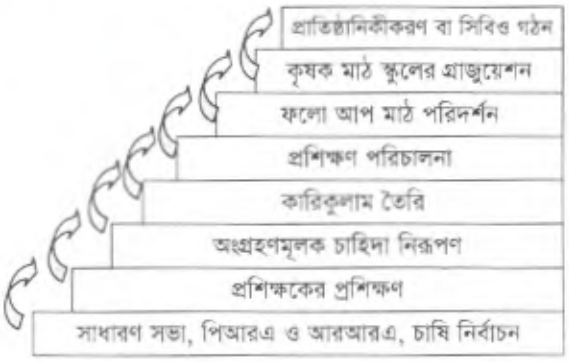

চিত্র ২ : কৃষক মাঠ স্কুলের বিভিন্ন ধাপসমূহ।

কৃষক মাঠ স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. চাষি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি হয়। চাষিরা কাজ করার মাধ্যমে বিভিন্ন চাষ ব্যবস্থা যেমন- ধান চাষ, মাছ চাষ বা হাঁস- মুরগি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে।

২. মাঠই শিক্ষণের ক্ষেত্র সকল শিক্ষণই মাঠের উপর ভিত্তি করে হয়। যেমন- ধান ক্ষেত, পুকুর/ঘের বা মুরগির খামারে অর্থাৎ শিক্ষণ প্লট থেকে চাষিরা শিক্ষা গ্রহণ করে। চাষিরা মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা অন্য চাষিদের মাঝে উপস্থাপন করে আলোচনার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করে।

৩. সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ন্যায় আচরণ না করে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

৪. সমন্বিত কারিকুলাম: ধানচাষ, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে Holistic Approach তৈরি করা হয়।

৫. প্রশিক্ষণটি মৌসুমব্যাপী: চাষিদেরকে কোন একটি চাষ ব্যবস্থা সমন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ধাপের কার্যক্রমসমূহ হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা শিক্ষণ উপকরণ তৈরি করা হয়।

যখন কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যগণ তাঁদের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে তখন তাঁদের কার্যক্রম টেকসই রাখার জন্য এবং তাঁদের দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের (institutionalization) জন্য এটাকে সমাজভিত্তিক সংগঠনে পরিণত করা যেতে পারে।

বর্তমানে আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন বরিশাল কম্পোনেন্ট সমাজভিত্তিক সংগঠনের (সিবিও) মাধ্যমে কৃষক মাঠস্কুল পরিচালনা করছে। প্রকল্পের মতে সমাজভিত্তিক সংগঠন হলো, কৃষি বিষয়ক উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজের চাষিদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিকট থেকে কর্মএলাকার সদস্য চাষিরা বা অন্যান্য চাষিরা সেবা পাবে। সিবিও গঠনের উদ্দেশ্য হলো উৎপাদনকারী (Producers) ও ব্যবহারকারীদের (Consumers) মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে চাষিদের মান সম্পন্ন উপকরণ কম মূল্যে প্রদান করা ও তাঁদের উৎপাদিত পণ্য উন্নত বিপণন ব্যবস্থায় বিক্রয় করে আর্থিক ভাবে তাঁদেরকে লাভবান করা। সেইসাথে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরেও যাতে সিবিও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন-উপজেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা পশুসম্পদ অফিস, উপজেলা কৃষি অফিস, বিভিন্ন এনজিও, হ্যাচারি, ফিড মিল ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪ : আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন বরিশাল কম্পোনেন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ কৌশল

সিবিও এর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন- নেতৃত্বের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন, হিসাব সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি প্রদান করা হয়। প্রকল্প আশা করে যে, প্রকল্পের সাথে কাজ করা ও সহায়তা পাওয়ার ফলে সিবিও গুলো তাঁদের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাবে, গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে টেকসই সিবিও হিসেবে গড়ে উঠবে।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, যদি জেলেদেরকে সংগঠিত করে এলাকাভিত্তিক দল গঠন করে কৃষক মাঠ স্কুল এপ্রোচ এর মাধ্যমে তাঁদের সচেতনতা, জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি করা যায়, তবে তাঁরা অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান করে উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে অর্জিত বর্ধিত আয়ে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। আর এই উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজন সিবিও গঠনের মধ্যদিয়ে তাঁদের সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

প্রবাহমান নদীতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ

মোঃ আসাদুল বাকী
মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর

খাঁচায় মাছ চাষ কেন?

বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে খাঁচায় মাছ চাষ নুতন আঙ্গিকে শুরু হলেও বিশ্ব অ্যাকুয়াকালচারে খাঁচায় মাছ চাষের ইতিহাস অনেক পুরানো। খাঁচায় মাছ চাষের সূচনা হয় চীনের ইয়াংঝি নদীতে আনুমানিক ৭৫০ বছর আগে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে আধুনিক কালে খাঁচায় মাছ চাষ ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

খাঁচায় মাছ চাষে বিশ্ব সম্প্রদায়

চীনে খাঁচায় মাছ চাষ বেশ জনপ্রিয়। ছোট খাঁচায় অধিক ঘনত্বে মাছ চাষের প্রচলন চীনেই প্রথম শুরু হয়। সম্পূরক খাবার প্রয়োগের মাধ্যমে খাঁচায় তেলাপিয়া ও কমন কার্পের চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়। তাইওয়ানে ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া খাঁচায় মজুদ করে ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া উৎপাদন করা হয় এবং ফিলেট (fillet, piece of meat or fish without bones) আকারে রপ্তানি করা হয়। দেশটি উচ্চ গুণগত মানের তেলাপিয়ার ফিলেট রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছে। তাইওয়ান ২০০৬ সালে, ২০,০০০ মেট্রিক টন ফ্রোজেন তেলাপিয়া এবং ৩১০০ মেট্রিক টন তেলাপিয়ার ফিলেট রপ্তানি করেছে।

ইন্দোনেশিয়ায় খাঁচায় মাছ চাষ জনপ্রিয় হলেও জাভা অঞ্চলে এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি। জাভার "সিরাতা" লেকে প্রায় ৩০,০০০ খাঁচায় মাছ চাষ করা হচ্ছে। থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে খুব সাধারণ জাল দিয়ে তৈরি খাঁচায় কোরাল বা ভেটকী মাছের চাষ করা হয় এক বছর মেয়াদের জন্য। সমুদ্র থেকে আহরিত ছোট মাছ (trash fish) খাঁচাতে মাছের খাদ্য হিসেবে দেয়া হয়। ভিয়েতনামে স্রোতশীল নদীতে খাঁচায় জলজ আগাছা সরবরাহ করে গ্রাস কার্প ও তেলাপিয়া চাষ করা হয়। নেপালের কাঠমান্ডুর পশ্চিমে পোখরা এলাকার লেকে খাঁচায় বিগহেড ও সিলভার কার্প মাছের চাষ করা হয় এবং লেকের পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাবার থাকায় অতি অল্প পরিমাণ খাবার প্রয়োগ করা হয়।

খাঁচায় মাছ চাষে বাংলাদেশ

বাণিজ্যিকভাবে খাঁচায় মাছ উৎপাদনকে বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরীক্ষামূলকভাবে খাঁচায় মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সীমিত পরিসরের এ কার্যক্রম সময়ে সময়ে পরিচালিত হয় মূলত গবেষণা ও স্নাতকোত্তর ছাত্র - ছাত্রীদের পাঠক্রমের অংশ হিসেবে। ১৯৮০ সালে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে কাপ্তাই লেকে সর্বপ্রথম খাঁচায় মাছ চাষ প্রকল্প হাতে নেয়।

১৯৯২ সালে কেয়ার বাংলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম মৎস্য সম্প্রসারণ প্রকল্প একটি মহিলা দলকে নিয়ে রংপুরের কুকরুল বিলে খাঁচায় মাছ চাষের উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে খাঁচায় মাছ চাষ বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক ও স্থায়িত্বশীল না হওয়ার পিছনে কয়েকটি মৌলিক উপাদানের অভাবকেই কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়:

ক. কাঁকড়া বা অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী কাটতে পারেনা এ ধরণের মানসম্পন্ন টেকসই জালের অভাব।
খ. নদীতে ব্যবহার উপযোগী ভাসমান খাদ্যের অভাব।
গ. ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় খাঁচায় মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি সম্পর্কে ধারণার অভাব।
ঘ. পরিবেশ ও সময়ের সাথে সংগতিপুর্ণ উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন ও যথাযথ প্রায়োগিক কারিগরি জ্ঞানের অভাব।

বাংলাদেশে খাঁচায় মাছ চাষের উত্তরণের সূচনা

চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে থাইল্যান্ডের প্রযুক্তি অনুকরণে খাঁচায় মাছ চাষের সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডাকাতিয়া নদীতে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন মডেলকে "ডাকাতিয়া মডেল" নামে অভিহিত করা হয়। এ মডেলের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে খাঁচায় মাছ চাষের কারিগরি দিকগুলো নিম্নরূপ:

স্থান নির্বাচন

- **পানির স্রোত বা প্রবাহমাত্রা**

  নদীতে ৪-৮ ইঞ্চি/সেকেন্ড মাত্রার প্রবাহে খাঁচা স্থাপন মাছের জন্য উপযোগী, তবে প্রবাহের এ মাত্রা সর্বোচ্চ ১৬ ইঞ্চি/সেকেন্ড এর বেশী না হওয়াই সমীচিন।

- **পানির গভীরতা**

  মূল খাঁচা পানিতে ঝুলন্ত রাখার জন্য ন্যূনতম ১০ ফুট গভীরতা থাকা প্রয়োজন। যদিও প্রবাহমান পানিতে তলদেশে বর্জ জমে গ্যাস দ্বারা খাঁচার মাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম তথাপি খাঁচার তলদেশ নীচের কাদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

- **পারিপার্শ্বিক অবস্থান**

  খাঁচা নদীর এমন অংশে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনক্রমেই নৌ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতে পারে; মাছ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে; প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন বন্যা, জলোচ্ছাস, নিম্নচাপ ইত্যাদি খাঁচা স্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে এবং কলকারখানার বর্জ নদীর পানিকে কলুষিত করে এ ধরনের অঞ্চল পরিহার করতে হবে।

খাঁচা তৈরির উপকরণ

- খাঁচা তৈরির মূল পলিইথিলিন জাল (০.৭৫ ইঞ্চি থেকে ১.২৫ ইঞ্চি ফাঁসের)
- রাসেল নেট (খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরিতে)
- নাইলনের দড়ি ও কাছি
- কভার নেট বা ঢাকনা জাল (পাখি ইত্যাদির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য)
- ১" জি. আই. পাইপ (৭০ ফুট প্রতিটি খাঁচার জন্য)
- ফ্রেম ভাসমান রাখার জন্য শূন্য ব্যারেল/ড্রাম (২০০ লিটারের পি.ভি.সি. ড্রাম, ওজন ৯ কেজি'র উর্ধে)
- খাঁচা স্থির রাখার জন্য গেরাপি (anchor)
- ফ্রেমের সাথে বাঁধার জন্য মাঝারি আকারের সোজা বাঁশ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)

খাঁচার আকার

খাঁচা তৈরির জন্য এমন জাল ব্যবহার করতে হবে যেন কাঁকড়া, গুইসাপ, কচ্ছপ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী জালগুলো কাটতে না পারে। ডাকাতিয়া মডেলের খাঁচার জন্য সাধারণতঃ দুই আকারের জাল তৈরী করা হয়, যেমনঃ ২০ ফুট×১০ ফুট× ৬ ফুট এবং ১০ ফুট×১০ ফুট× ৬ ফুট।

ফ্রেম তৈরি ও স্থাপন

খাঁচাগুলোর ফ্রেম তৈরি করতে প্রথমতঃ ১ ইঞ্চি জিআই পাইপ দ্বারা আয়তাকার ২০ফুট×১০ফুট ফ্রেম তৈরি করা হয় । আর মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরি করা হয়। এতে একটি ফ্রেমে সরাসরি ২০ফুট×১০ফুট আকারের খাঁচা বসানো যায় আবার প্রয়োজনবোধে ১০ফুট×১০ফুট আকারের দুইটি খাঁচাও বসানো যায়। প্রতি দুই ফ্রেমের মাঝে ৩টি ড্রাম স্থাপন করে সারিবদ্ধভাবে ফ্রেমগুলো স্থাপন করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরাপী বা নোঙর দিয়ে খাঁচা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে শক্তভাবে বসানো হয়। এরপর প্রতিটি ফ্রেমের সাথে পৃথক পৃথক জাল সেট করা হয়।

চিত্রঃ লক্ষ্মীপুরে মেঘনা নদীর খালে প্রবাহমান পানিতে ভাসমান খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ

খাঁচায় মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ

পানির স্রোত, জালের ফাঁসের আকার, পানির গভীরতা, প্রত্যাশিত আকারের মাছ উৎপাদন, খাদ্যের গুণগতমান এবং বিনিয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করেই মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। থাইল্যান্ডের বিভিন্ন নদীতে খাঁচায় মাছ চাষে প্রতি ঘনমিটারে ৩৭টি মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা (যাদের গড় ওজন ৫০ গ্রাম) মজুদ করা হয়ে থাকে। আর লক্ষীপুর ও চাঁদপুরে খাঁচাগুলোতে প্রতি ঘনমিটারে ৩০ হতে ৪২টি পর্যন্ত মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা (যাদের গড় ওজন ২৫ গ্রাম) মজুদ করা হচ্ছে।

খাঁচায় সম্পূরক খাদ্য

বাণিজ্যিকভাবে খাঁচায় মাছ চাষ পরিচালনার জন্য প্রবাহমান পানিতে ভাসমান খাদ্যের বিকল্প নেই। বর্তমানে বেসরকারি উদ্যোগে মাছের খাদ্য বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করার জন্য বহু খাদ্য কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তন্মধ্যে মেগা ফিডস, এবং রূপসী ফিস ফিডস এর তৈরি ভাসমান খাবার উল্লেখযোগ্য।

মনোসেক্স তেলাপিয়াকে খাঁচায় মজুদের পর হতে বাজারজাত করার পূর্ব পর্যন্ত (৩০০-৫০০ গ্রাম/প্রতিটি) যে খাদ্য প্রদান করা হয় তাতে দৈহিক ওজনের বিবেচনায় খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ৮% - ৩% এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে লব্ধ ভাসমান খাবার ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, মজুদ থেকে শুরু করে বাজারজাত পর্যন্ত এক কেজি তেলাপিয়া উৎপাদন করতে সর্বোচ্চ ১.৫ কেজি খাদ্য ব্যবহৃত হয়।

গ্রেডিং

প্রত্যাশিত উৎপানের জন্য খাঁচায় পোনা মজুদের তিন সপ্তাহ পর প্রথম বার খাঁচার মাছ বাছাই করতে হবে। দিনের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ্য রেখে সকাল বেলা কিংবা পড়ন্ত বিকালে খাঁচার মাছ বাছাই করা উচিত। যখন নদীর পানি বেশী প্রবাহমান থাকে তখন খাঁচার পানি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে, এ সময় খাঁচার মাছ গ্রেডিং করা অধিক উপযোগী। বাজারজাত করার পূর্বে প্রয়োজন অনুসারে দুই তিনবার গ্রেডিং করতে হবে।

বর্তমান বাজারমূল্যে ৫০টি খাঁচা স্থাপনের জন্য স্থায়ী খরচ নিম্নরূপ

ক্রমিক	উপকরণের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	এককমূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	সেলাই করা জাল	৫০ টি	৩৫০০	১৭৫০০০
২	খালি বা শূন্য ড্রাম বেরেল	১৫৩ টি	১৪৫০	২২১৮৫০
৩	১ ইঞ্চি জি.আই পাইপ	৩৬০০ ফুট	৮০	২৮৮০০০
৪	ফ্রেমের সংযোগ লৌহ	৩৫০ টি	১০০	৩৫০০০
৫	গেরাপী (anchor)	১২ টি (২০ কেজি প্রতিটি)	২৪০০	২৮৮০০
৬	গেরাপী বাঁধার কাছি	৫ কয়েল	৫০০০	২৫০০০
৭	বাঁশ	১০০ টি	২০০	২০০০০
১০	নাইলনের সুতা ও রশি			৫০০০
৫০টি খাঁচা স্থাপনে মোট খরচঃ				৭৯৮৬৫০/=

৫০ টি খাঁচার এক ফসলের উৎপাদন খরচ নিম্নরূপ

ক্রমিক	উপকরণের নাম	পরিমাণ/সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	মাছের পোনা সংগ্রহ	৬০০০০	২	১২০০০০
২	মাছের খাদ্য	২৪৫০০ কেজি	২৮	৬৮৬০০০
৩	শ্রমিক খরচ ছয় মাসের জন্য	৩ জন (৩০০০ টাকা হিসেবে)		৫৪০০০
				৮৬০০০০/=

মাছের উৎপাদন

প্রতিটি খাঁচায় একটি ফসলে সর্বনিম্ন ৩৫০ কেজি হিসেবে
৫০টি খাঁচায় (৩৫০× ৫০) = ১৭৫০০ কেজি
প্রতি কেজি মাছের পাইকারী
বাজারমূল্য = ১০০ টাকা
মোট মাছ বিক্রয় = ১৭৫০০০০ টাকা
নীট লাভ = (১৭৫০০০০-৮৬০০০০) টাকা
= ৮৯০০০০ টাকা
(এখানে এককালীন স্থায়ী স্থাপনা খরচ গণ্য করা হয়নি)

শেষ কথা

বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় আমাদের দেশে প্রচুর উপযোগী নদী রয়েছে যেগুলোতে সারা বছর খাঁচায় মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। যেহেতু আমাদের দেশে এবং বিদেশেও তেলাপিয়া মাছের প্রচুর চাহিদা আছে আর আমাদের দেশের নদী কিনারায় বসবাসরত জনগণ বিশেষ করে জাল নির্ভর জেলেগোষ্ঠী যারা শুধুমাত্র নদী থেকে প্রাকৃতিক মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদেরকে সংগঠিত করে একদিকে যেমন মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব অন্যদিকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ করে নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতিগুলোর প্রজনন মৌসুমে তাদের নিবৃত্ত করে নদীর প্রাকৃতিক মাছের মজুদ বাড়ানো ও প্রজাতিগুলোকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা সম্ভব। কাজেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাস্তব প্রায়োগিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান খাঁচায় উৎপাদিত এ তেলাপিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিযোগ্য মানের। এশিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও খাঁচায় উৎপাদিত এ মানসম্পন্ন তেলাপিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার এখনই উপযুক্ত সময়। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তেলাপিয়া বাজারে প্রবেশের জন্য নীতিনির্ধারণী মহলসহ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

বিলকোলা-মৎস্য চাষ সম্প্রসারণে এক ব্যতিক্রমি উদ্যোগ

মোঃ আমিনুল হক
মুহঃ নিয়াজ উদ্দিন
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

রাজশাহী জেলার অদূরে বাগমারা উপজেলায় অবস্থিত বিলকোলা। এ বিলের আওতাধীন সকল জমিই ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থাৎ বেসরকারি। শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) বিলের আয়তন ২০০ একর, এপ্রিল-মে মাসে ৪০০ একর ও বর্ষা মৌসুমে সর্বোচ্চ ১১০০ একরে উন্নীত হয়। বিলের চারপাশে ৯০০ পরিবার বেষ্টিত চারটি গ্রাম রয়েছে এর মধ্যে খাল রয়েছে দুইটি, পুকুর চারটি যেখানে সারা বছর পানি থাকে। জমি আবাদের জন্য গভীর নলকূপ পাঁচটি ও বিদ্যুৎ চালিত পাওয়ার পাম্প রয়েছে সাতটি। জমির মালিকানাবিহীন ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে মৎস্যচাষি সমিতি গঠিত হয় এবং সমিতির সুফলভোগী সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। অধিকতর নিচু ভূমি হওয়ায় প্রতি বছর প্লাবিত হয় এবং কৃষকেরা শুধুমাত্র একটি ফসল ঘরে তুলতে পারে। আর কোন ফসল পায় না ফলে ৬-৭ মাস কর্মহীন হয়ে পড়ে।

মূলত শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত সমিতির সুফলভোগী কিছু উদ্যমী যুবক এই বিশাল প্লাবিত জলাভূমি বিলকোলাকে মাছ চাষের আওতায় আনার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্যতিক্রমী এ কারণেই যে, জমির মালিকগণের সাথে এক অনন্য সমঝোতা ও অলিখিত চুক্তি জমি আবাদের প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যয় এই সমিতির মাধ্যমে পরিশোধিত হবে; বিনিময়ে প্লাবিত জলাভূমিতে মাছ চাষ করে এর লভ্যাংশ সমিতির সদস্যরা সমভাবে ভাগ করে নেবে। উভয় গ্রুপ উপকৃত হওয়ায় যেই চুক্তি সেই কাজ। তাই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি হয় ২০০৭ সালেই। ধান চাষের সাথে সাথে বিলে অবস্থিত চারটি পুকুরের রুই জাতীয় মাছের ধানীপোনা মজুদ করে পোনার প্রতিপালন করা হয়। এই পোনা গুলো ৬ - ৭ ইঞ্চি বড় হলে বিলের নিচু জমি ও পুকুর ডুবতে থাকে এবং বিলের সর্বত্র এ পোনা ছড়িয়ে পড়ে।

দুটি খালে দুটি বানা তৈরিতে খরচ হয় ৩৫০০০০ টাকা। এছাড়াও পোনা, খাদ্য, সার সহ বিভিন্ন উপকরণে সর্বমোট ব্যয় হয় ৩২০০০০০ টাকা। আহরিত মাছের মোট বিক্রয় মূল্য ছিল ৪১০০০০০ টাকা। প্রথম বছরেই মাছ চাষ করে নীট মুনাফা হয় ৯০০০০০ টাকা। এই মুনাফা সুফলভোগীরা লভ্যাংশ হিসেবে ভাগ করে নেয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও মূলধন বিনিয়োগে প্রথম বছর উৎপাদন ব্যয় ছিল বেশি । পরবর্তী বছরে উৎপাদন ব্যয় কমে মুনাফা আরও বৃদ্ধি পাবে নিশ্চিত ভাবে।

পুকুরে মাছ চাষে উত্তরোত্তর সাফল্যের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে ভবিষ্যতে নিবিড় মাছ চাষে পুকুর হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ কমে আসবে। ইতোমধ্যে জনগণের সচেতনতা ও সরকারি উদ্যোগে দেশের অধিকাংশ বিল চাষের আওতায় এসেছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এখন সম্ভাবনাময় প্লাবণ ভূমিকে পরিকল্পিতভাবে মাছ চাষের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এদেশে প্রায় ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমি আছে। বর্তমানে এ সকল জলাশয় থেকে গড় উৎপাদন হয় মাত্র ০.১৫ মে. টন / হেক্টর। বিস্তৃত এ প্লাবনভূমির উপযোগী অংশে বিলকোলার ন্যায় দেশের সকল প্লাবনভূমিকে সামাজিক মাছ চাষের আওতায় এনে ২০-২১ লক্ষ মে. টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, সফল সংগঠক সৃষ্টি, পরিবেশ দূষণ হ্রাস, স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। বিলকোলা গ্রামবাসীর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করেছে, নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সামাজিকভাবে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শী, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আইনগত, পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে ঝুঁকি হ্রাস করেছে। প্রথম বছরের সাফল্যে মৎস্য বিভাগের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি 'প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের' মাধ্যমে জন, জমি ও জলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বিলকোলাবাসী নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তনসহ দেশের উন্নয়নে এক সোনালী স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড : আমাদের দায়িত্ব

ড. আনোয়ারা বেগম শেলী
কারিতাস মাৎস্য কর্মসূচি

আবহমানকাল থেকে মাছ আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। **'মাছে ভাতে বাঙালীর'** মতো প্রবাদ অন্য কোন খাদ্য উপাদান নিয়ে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। এদেশের মানুষের কাছে মাছ অতি প্রিয় খাদ্য, আর তাই নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় মাছের উপস্থিতি অপরিহার্য। যে সময়ে 'মাছে ভাতে বাঙালী' প্রবাদটি লোকমুখে বহুল প্রচলিত ছিল–সে সময়ের মাছগুলো আমাদের দেশীয় মাছই ছিল। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের মাছ বলতে দেশীয় মাছই ছিল একচেটিয়া। খাল, বিল, নদী-নালা, হাওর-বাওড়, পুকুর দিঘিসহ বিভিন্ন ধরনের জলসম্পদে এদেশ সব সময়ই সমৃদ্ধ ছিল–আর সেসব আধারে ছিল দেশীয় মাছের উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধি সহায়ক পরিবেশ যা সহজলভ্য পুষ্টির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। স্বাধু ও লোনা পানি মিলিয়ে আমাদের রয়েছে প্রায় ৮০০ প্রজাতির মাছ। মিঠাপানি এলাকায় ২৬৪ প্রজাতির মাছের এক সমৃদ্ধ মৎস্য বৈচিত্র মাছের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে ধরে নেয়া যায়। পাবদা, টেংরা, পুঁটি, চাপিলা, বোয়াল, আইর, মাগুর, বাচা, কাজলি কত বিচিত্র নাম, কত বৈচিত্রপূর্ণ স্বাদ ...।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতি আহরণ, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, আবাস্থলের সংকোচন, কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, পানি দূষণসহ নানাবিধ মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে আমাদের মৎস্য ভাণ্ডারের ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধি হারিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষয়িষ্ণুধারা যেমন পরিমানগত দিক থেকে তেমন বৈচিত্রগত দিক থেকে। দুঃখজনক পরিনতি হিসেবে ৫৪ প্রজাতির দেশীয় মাছ আজ বিপন্ন (আইইউসিএন)। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জণগোষ্ঠীর মৎস্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে রুইজাতীয় মাছের ব্যাপক চাষাবাদ শুরু হয়। দেশীয় জাতের মাছের উৎপাদন কমে যাওয়া ও রুইজাতীয় মাছের উৎপাদন প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গত আট-দশ বছরে মাছের সরবরাহ ও বাজার মূল্যে আশ্চর্য রকমের এক বিপরীত ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় কিংবা বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে অতীতে যেসব মাছ সহজলভ্য এবং প্রচুর পরিমাণে দেখা যেতো, সেসব দেশীয় অনেক প্রজাতির মাছ আর বাজারে দেখা যায়না– স্বল্প পরিমানে দেখা পেলেও তা সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার আওতায় পড়েনা। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়ে যাওয়া এবং মাংস ও তৈলাক্ত বড় মাছ স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে আজকাল শহরের মানুষের মেনুতে দখল নিয়েছে দেশী জাতের মাছ। তাই ক্রেতার ভীড় বাড়ছে দেশী মাছের দিকে, অবস্থা বুঝে আকাশ ছোঁয়া দাম হাঁকছে বিক্রেতা। কুড়ি বছর আগেও পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানের মেনুতে –মাংসের বিভিন্ন আইটেম স্থান পেতো–মাছের উপস্থিতি ছিলনা বললেই চলে। কিন্তু আজকাল মাংসের পাশাপাশি মাছের আইটেম থাকে। হোটেল, রেস্তোরাগুলিও হরেকরকম দেশী মাছের লোভনীয় পদ রান্না করে স্বাস্থ্য সচেতন – ভোজন বিলাসী গ্রাহকের রসনা মিটিয়ে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই সত্যে উপনীত হবো – রুইজাতীয় / বড় মাছ গরীবদের মাছ – কারণ ছোট মাছ ইতোমধ্যেই তাদের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেছে। বাজার মূল্য ও সরবরাহের এই বিপরীত ধারা আমাদেরকে মৎস্য কর্মকাণ্ডে আগামীর জন্য নূতন চিন্তা ভাবনা করার তাগিদ দেয়।

দেশীয় মাছকে মূল্যায়ন করা/গুরুত্ব দেয়া

অতীতে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া পর্যাপ্ত দেশীয় মাছ ছিল বলে পছন্দের সুযোগ ছিল, আর তাই দেশীয় মাছকে আবার কূলীন ও অকূলীন দু'টিভাগে ভাগ করেছি –কিছুসংখ্যক দেশীয় মাছকে অকূলীন সাব্যস্থ করে নাম দিয়েছি আমাছা। কূলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিং, মাগুর, পাবদা, রুই, টেংরা, আইর, চিতল, মলা, ঢেলা, চান্দা, মেনী, টাকি ইত্যাদি। আমাছা বলে অবহেলা ভরে দেখেছি যাদের তারা হলো–কানি পোনা, ছ্যাপ চেলা, কুলি, দাঁড়কিনা ইত্যাদি। পুষ্টি বিবেচনায় দেখা গেছে প্রায় সকল ছোট মাছের পুষ্টিমান বড় মাছের তুলনায় অনেক বেশি

(Wahab et al. ২০০৫) আমাছা বলে অবহেলিত দাঁড়কিনা মাছের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ গ্রাম মাছে ১৫.৬ গ্রাম আমিষ ও ১৪৫৭ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-এ রয়েছে (Thilsted et al. ১৯৯৭)। একই পরিমান রুই এর ক্ষেত্রে অমিষ প্রায় কাছাকাছি (১৬.৬ গ্রাম) কিন্তু ভিটামিনের পরিমাণ মাত্র ২৭ মাইক্রোগ্রাম। আর এতে করে ধারণা করা যায় যে আমাছা গোত্রের মাছগুলোর পুষ্টিমান বড় মাছের তুলনায় বেশি। ছোট মাছ কাঁটাসহ খাওয়া হয় তাই ছোট মাছ থেকে ক্যালসিয়ামও বেশি পাওয়া যায়। সময় এসেছে এই নামকরণের বৈষম্য ঘুচাতে। এইজন্য সেই মাছগুলোর পুষ্টিমান নির্ধারণপূর্বক ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নিতে হবে।

পদ্ধতিগত মাছ চাষের উদ্যোগ নিতে গিয়ে চাষের জলাশয়টিকে শুধুমাত্র চাষযোগ্য মাছের আবাসস্থল করা হয়। পুকুর শুকিয়ে অথবা রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করে প্রথমে দেশীয় জাতের মাছ নিধন করে তবে চাষের পোনা ছাড়া হয়। প্রস্তুতির এই পর্যায়ে কোন ঘাটতি থেকে গেলে অথবা বন্যা, জলোচ্ছাসের সুযোগে, এমনকি পোনা নির্বাচনে ভুলের কারণেও দেশী জাতের মাছ যেমন মলা, ঢেলা, পুঁটি, বেলে চাষ পুকুরে দেখা দিতে পারে-আর তখনই চাষি মাথায় হাত দিয়ে বসে-তার পুকুরে অবাঞ্চিত মাছ স্থান করে নিয়েছে বলে। রুইজাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশীজাতের সাথী মাছকে অবাঞ্চিত বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে রুইজাতীয় মাছের সাথে এসব দেশীয় মাছের চাষ করা যায় এবং ভাল উৎপাদন পাওয়া যায় (Kohinoor 2000, Wahab et al 2003)। সময়ের সাথে সাথে চাহিদা ও সরবরাহের দুস্তর ব্যবধানের কারণে আজ আর তারা অবাঞ্চিত কেউ নয়, একান্তই বাঞ্চিত, কাঙ্ক্ষিত এবং স্বপ্নের আমিষ উপাদান। বরং মূল চাষের মাছের চেয়ে সাথী মাছের বাজার মূল্য বেশি। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সাথী মাছ নাম দিয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছকে ভোক্তা সাধারণের জন্য সহজলভ্য করার পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

চাষ পদ্ধতির উপর গবেষণা এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

যেসব মাছের চাহিদা প্রচুর, প্রাপ্তি অপ্রতুল, বাজারমূল্য উচ্চ এমন প্রজাতির চাষ পদ্ধতির উপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আইর, বোয়াল, শোল, চিতলজাতীয় মাছগুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদন লাভজনক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এদের দৈহিক বৃদ্ধি লক্ষণীয়-চাহিদাও প্রচুর। এছাড়া ছোট মাছের ক্ষেত্রেও ব্যাপক গবেষণা দরকার যেমন – চাপিলা, বাঁশপাতা, বেলে, বাচা, রিটা, বাইম, ঘনিয়া, কালবাউস ইত্যাদি। উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু মাছ রয়েছে সেগুলোর চাষ পদ্ধতি জানা গেলে লাভজনক উৎপাদনে যাওয়া যায়। অনেক দেশে ভেটকি মাছের চাষ লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া পায়রা, দাতিনা, কাইনসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্য স্বল্প লবণাক্ত জলাশয়ে চাষ উপযোগী পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিতে হবে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত মাছের বিষয়টি যাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের অতি প্রিয় বাঘাআইর, নান্দিনা, বাচা, রিটা, স্বরপুটি, ভাঙ্গন, পাঙ্গাস ইত্যাদি। বিপন্ন এই প্রজাতিগুলোর বিলুপ্তি আশংকা ঠেকানোর পদক্ষেপ নিতে দেরি হলে-দেশীয় মৎস্য প্রজাতির বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

অত্যন্ত আশার কথা-টেংরা, গুলসা, পাবদা, কৈ, মাগুর চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই হয়েছে এবং এসব মাছের পোনা কৃত্রিম ভাবে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হবে এদরে পোনা সহজলভ্য করা আর খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, অতঃপর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্যাগ নেয়া। সুখের কথা হল এসব মাছের ভোক্তা তথা বাজার তৈরি হয়ে আছে।

ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশের মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলকারী জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের অহংকার। জাতীয় উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে সবচেয়ে বেশি (১৪%) অবদান রাখা এই ইলিশের সাথে জড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর জীবন-জীবিকা। কিন্তু দেশীয় এই মাছটির আবাস অঞ্চল দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। অতীতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত রুপালী ইলিশের নির্বিঘ্ন গতিবিধি ছিল। ফরিদপুরের গোয়ালন্দ ছিল ইলিশের সর্বোচ্চ সমাগম এলাকা, সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। আর আজ! ভর মৌসুমেও মুন্সিগঞ্জ এলাকার উপরে ইলিশ দেখা যায় না, খুব বড় জোয়ার-জলোচ্ছাস হলে পরে অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় দু'চারটা ইলিশ মানিকগঞ্জ পর্যন্ত আসে। নদী ভরাট হওয়া, চর পড়ে যাওয়া, দূষণ, প্রজনন স্থল এর বিশেষ যত্ন না নেয়া এসব

কারণে ইলিশ বসতি সরে সরে সমুদ্রের দিকে পিছু হাঁটছে। আর এতে করে ইলিশের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবীরা জীবন-জীবিকা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে–ধাবিত হচ্ছে ইলিশের পথ ধরে। নির্দিষ্ট এলাকার জেলেসংখ্যা বাড়ছে, বাঁচার তাগিদে নির্বিচারে 'জাটকা' হত্যা করছে – দেশ হারাচ্ছে চার থেকে পাঁচ হাজার টন ইলিশের উৎপাদন। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে সম্প্রতি 'জাটকা' রক্ষার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, মানতে বাধ্য করা হচ্ছে আহরণের নিষিদ্ধ সময়। এই ব্যবস্থা টেকসই করতে হলে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার দায়-দায়িত্ব নিতে হবে, দিতে হবে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা।

ইলিশ প্রকৃতির দান, চাষ বা খাবারের জন্য পুঁজির প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আংশিক জাটকা ধরা বন্ধ করে প্রথম বছরে (২০০৩-০৪) সালে উৎপাদন বেড়েছে ৫৬,০০০ মেঃ টন, ক্রমান্বয়ে বেড়ে তা ২০০৫-০৬ তে প্রায় ৮০,০০০) মেঃ টনে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিবছর এতে জাতীয় আয়ে যোগ হয়েছে অতিরিক্ত হাজার কোটি টাকা। এখন জাটকা সেক্টরে পুঁজি এবং আয়ের নিরীখে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পের আঙ্গিকে চিন্তা করতে হবে। সকল জাটকাকে পরিপক্ক মাছ হিসেবে পাওয়ার তাগিদে মৎস্যজীবীদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভাবা হলে, ইলিশ উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করে।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় মাছ বৃদ্ধি

আমাদের দেশে হাওর-বাঁওড়, নদ-নদী, খাল-বিলসহ প্রায় ১৩ হাজার মুক্ত জলাশয় রয়েছে এবং এই জলাশয়গুলি দেশীয় মাছের প্রধান উৎস। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া গেলে ৪০ লক্ষ হেক্টরের এই জলাভূমিতে উৎপাদন ৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ মে ২০০৫)। ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ ধরনের জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার সুযোগ দিলে জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে, জীববৈচিত্র্য টিকে থাকে, ব্যবহারকারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক ইতিবাচক ধারা সুস্পষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গৃহিত উদ্যোগের ফলে কিছু কিছু জলাশয়ের ভৌত-অবকাঠামোগত পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মাচ, সিবিএফএম প্রকল্পের বিল-হাওরের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। ভরাটজনিত কারণে শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে আসা বিল-হাওরগুলিতে ব্যাপক খনন কাজ করে অভয়াশ্রমের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে – এখন সে সব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন, বৈচিত্র্য, আবাসস্থল উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

দেশীয় মাছের উৎপাদন বাড়াতে হলে দেশের সকল অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থান অতীতের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। অন্ততঃ আংশিক জলাশয়ে সাংবাৎসরিক পানি থাকার উদ্যোগ নিতে হবে, গড়তে হবে অভয়াশ্রম। যে অঞ্চলে/জলাশয়ে যে যে দেশীয় মাছ অতীতে ছিল অথচ এখন বিরল এমন প্রজাতিকে নূতন করে স্থান করে দিতে হবে। জীবন-জীবিকার তাগিদে জলাশয়ের দায়িত্ব নিয়ে মাছের যত্ন নিবে, ফলন বাড়াবে – তাদেরকেই দীর্ঘমেয়াদে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে। রাজস্বভিত্তিক ইজারা ব্যবস্থা অকার্যকর করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে উৎপাদনভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কায়েম করা জরুরি। ক্ষমতা-প্রতিপত্তি আর ব্যবসায়িক স্বার্থে যেন এদেশের জলাশয়ের জলে দরিদ্র মৎস্যজীবীর চোখের জল মিশে না যায়–সকল মহলকে এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। আর এতে করে দেশীয় মাছের পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে বলে আমরা আশাবাদী।

চিতল: আমাছা নিয়ন্ত্রণ ও বাড়তি উৎপাদন

এ কে এম আমিনুল হক পিএইচডি
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

চিতল *Chitala chitala* Notopteridae পরিবারভুক্ত এশিয়া মহাদেশীয় একটি শিকারি মাছ (Predator)। মাছটির গড়ন বেশ দৃষ্টিনন্দন। পৃষ্ঠদেশ অতি উত্তল, অর্ধ চন্দ্রাকৃতির ও গাঢ় ধূসর। মাথা ও দেহ পার্শ্বীয়ভাবে চাপা এবং অতি সূক্ষ্ম সাদা আঁইশে সারাদেহ আবৃত। গালসি (Mouth gape) চক্ষু কোটরের পশ্চাতেও প্রসারিত। পৃষ্ঠদেশের উভয় পাশে ১৫টির মত খাড়া রূপালি ডোরা, লেজের দিকে ৫-৯টি গোলাকার কাল টিপ, সরু উত্তল ছুরির মত বাঁকানো মাথা এবং অতি অবতল ঘাড় মাছটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে। অতি সুস্বাদু বলে মাছটির চাহিদা প্রচুর। চিতলের পেটি ও কোপ্তা ভোজনরসিক বাঙ্গালির অতি প্রিয় ব্যঞ্জন। জলাশয়ে শুভ্রধবল চিতলের ডিগবাজি মনোমুগ্ধকর।

গুরুত্ব ও উপযোগিতা

মাছটির প্রধান খাদ্য পুঁটি, মলা, চেলা, চান্দা, টাকি, চিংড়ি ইত্যাদি ছোট ছোট আমাছা মাছ (Weed fish)। মাছচাষের পুকুরে বা বিলে এসব ছোট মাছ এমনিতেই জন্মে থাকে। এরা চাষকৃত রুইজাতীয় মাছের সাথে খাদ্য প্রতিযোগিতা করে, খাদ্য গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, অক্সিজেন স্বল্পতা ও রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটায়। মাছ চাষের জলাশয়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে চিতলের পোনা মজুদ করে এদের অবাঞ্ছিত জন্মহার, প্রাদুর্ভাব ও ক্ষতিকর প্রভাব কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অন্যদিকে প্রায় নিখরচায় মূল্যবান, সুস্বাদু ও অবলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী চিতল মাছের একটি বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায়।

পরিচিতি ও জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী

চিতল একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাংসাশী (Carnivore) মাছ। মাছটি দৈর্ঘ্যে ১২২ সেমি ও ১৫-২০ কেজি ওজন হয়ে থাকে। পুকুরে চাষকৃত মাছ ২-৩ বছরেই প্রজননক্ষম হয়। বাংলাদেশের মিঠা পানির নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর-বাওড় ইত্যাদি উন্মুক্ত ও আধা-উন্মুক্ত জলাশয় মাছটির প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ও আবাসস্থল। বড় পুকুর-দিঘিতেও এই মাছ বাস করে ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে প্রজননও করে। খাদ্যস্তরে মাছটির অবস্থান সর্বোচ্চ স্তরে। Trophic Level III তে উৎপাদিত প্রাণিকে সরাসরি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই স্তরের প্রাণীর খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা সবচেয়ে বেশি। মাছটির খাদ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেশিক বিচরণগত অবস্থান এবং তলদেশভোজী (Bottom feeder) হলেও শিকারের সন্ধানে জলাশয়ের উপর-নিচ-মধ্যস্তর চষে ফিরে।

জলাশয়ের ভৌত-রাসায়নিক ও জীবপ্রতিবেশিক অবস্থা

চিতল স্বচ্ছ, পরিষ্কার পানি ভালবাসে। জলাশয়ে কিছু হালকা জলজ আগাছা যেমন- শাপলা, পদ্ম, ঝিঁঝিঁদাম ইত্যাদি থাকলে মাছটি স্বস্তি বোধ করে ও এসব জায়গাতেই বেশির ভাগ সময় অবস্থান করে। পাঁক ও কচুরিপানাপূর্ণ জলাশয় মাছটি পছন্দ করে না। কম অক্সিজেনেও মাছটি বেঁচে থাকতে পারে। মাছটি ঈষৎ অম্লীয় পানি পছন্দ করে এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলি জলজ আগাছার পঁচনক্রিয়ার কারণে কিছুটা অম্লধর্মী হয়ে থাকে। চিতলের জলাশয়ের সর্বাধিক অনুকূল ভৌত-রাসায়নিক মান ও জীবপ্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য সারণি ১ তে দেয়া হলো।

সারণি-১ : চিতলের জলাশয়ের সর্বাধিক অনুকূল ভৌত-রাসায়নিক মান ও জীবপ্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য

বিষয়	মান/ মাত্রা
পানির স্বচ্ছতা	পরিষ্কার, স্বচ্ছ
পানির তাপমাত্রা	২৪°- ২৮° সেঃ
দ্রবীভূত অক্সিজেন	২- ১০ পিপিএম
পিএইচ	৬.০ - ৮.০
লবণাক্ততা	০- ৫ ‰
প্রতিবেশিক বিচরণগত অবস্থান (Spatial niche)	জলাশয়ের তলদেশ (Bottom dweller)
খাদ্যখাদকতা (Trophic niche)	জলাশয়ের তলদেশের খাদ্য (Benthivore)

প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

বাংলাদেশের মিঠাপানির নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ে জুন-জুলাই মাসে চিতল মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ দিঘি-পুষ্করিণী যেখানে মৃদু স্রোত ও প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান সেখানেও চিতল প্রাকৃতিকভাবেই প্রজনন করে থাকে। চিতল এক মৌসুমে সব ডিমই একসাথে ছাড়ে না ১০-১২ দিন পর পর কয়েক দফায় ডিম ছেড়ে থাকে। সাধারণত: মৃদু স্রোতে গাছের গুঁড়িতে স্ত্রী মাছ ডিম ছাড়ে। পুরুষ মাছ ডিম নিষিক্ত করে ডিম পাহারা দেয়। গাছ, কাঠের গুঁড়ি বা যে কোন অবলম্বনের সাথে আলতোভাবে এঁটে থাকা ৩-৫ মিঃ মিঃ স্ফটিকস্বচ্ছ বড় বড় ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা বের হতে ৫-৭দিন সময় লাগে। প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমেও মাছটির পোনা উৎপাদন করা যায়। পিটুইটারি হরমোন নির্যাস বা ওভাপ্রিম ইত্যাদি কৃত্রিম প্রণোদক দ্রব্য দিয়ে মাছটির প্রণোদিত প্রজনন করা যায় (সারণি-২)।

সারণি-২: চিতলের প্রণোদিত প্রজননে প্রণোদক দ্রব্য প্রয়োগের মাত্রা, সময় ও স্ফুটন সময়

প্রণোদক দ্রব্য	১ম ইঞ্জেকশন (মিগ্রা/ কেজি)		২য় ইঞ্জেকশন (মিগ্রা/ কেজি)		ডিম নি:সরণ (Ovulation)	ডিম প্রস্ফুটন (Hatching)
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী		
পিটুইটারি নির্যাস	-	২	২	৮	৬-৮ঘন্টা পর	৫-৭ দিন
ওভাপ্রিম	১-২	১-২	-	-	৮-১০ ঘন্টা	ঐ

এক্ষেত্রে স্ত্রী মাছকে ১ম দফা ২ মিগ্রা /কেজি ও ৬-৮ ঘন্টা পর ২য় দফায় ৮ মিগ্রা/ কেজি (ব্রুড মাছের শরীরের ওজনের) প্রয়োগ করতে হয়। পুরুষ মাছকে শুধু একবারই ২ মিগ্রা/কেজি ইঞ্জেকশন করতে হয়। ৬-৮ ঘন্টা পর চাপন পদ্ধতিতে ডিম ও শুক্র সংগ্রহ এবং মিশ্রণ করে ট্রে বা স্ফুটন বোতলে রেণু উৎপাদন করা হয়।

প্রাকৃতিকভাবে জলাশয়ে রেণু উৎপাদনের ক্ষেত্রে রেণু পোনাকে তেমন কোন খাদ্য দিতে হয় না। তবে হ্যাচারিতে কৃত্রিম প্রজনন বা প্রাকৃতিক জলাশয় হতে সংগৃহীত ডিম হতে উৎপাদিত রেণুপোনাকে জীবন্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। প্রথম ৩-৪ দিন পুঁটিমাছের রেণু সরবরাহ করলে ভাল হয়। তারপর ৫-৭ দিন রুইজাতীয় রেণু সরবরাহ করতে হয়। ক্রমান্বয়ে ধানী ও পোনা খেতে শিখে। ৫-৭ দিন ট্রেতে যত্ন নেয়ার পরই পোনাগুলিকে সিস্টার্ন, বড় চৌবাচ্চা বা নার্সারি পুকুরে স্থানান্তর করা উচিত। ২৫-৩০ দিন পরিচর্যা করলেই এগুলি জলাশয়ে মজুদযোগ্য ৪-৫ ইঞ্চি আকারের হয়।

চাষ প্রণালী ও মজুদ ঘনত্ব

বৃহৎ উন্মুক্ত জলাশয় যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই প্রচুর ছোটমাছ জন্মে সেখানে এই মাছের চাষ লাভজনক। কেননা সেখানে আলাদাভাবে মাছটির জন্য কোন খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। পুকুর-দিঘিতে চাষ করতে হলে পর্যাপ্ত ছোট মাছের যোগান নিশ্চিত করতে হয়। সাধারণভাবে দৈনিক মাছটির শরীরের শতকরা ১০ ভাগ হারে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। চিতল নাইলোটিকা চাষের পুকুরের প্রাকৃতিকভাবে স্বতঃউৎপাদিত প্রয়োজনাতিরিক্ত অবাঞ্ছিত পোনার প্রবেশন (Recruitment) কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার পাঙ্গাস ও রুইজাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে চান্দা ইত্যাদি আমাছা বিভিন্নভাবে চাষকৃত মাছের উৎপাদন ব্যাহত করে । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যায় চিতলের পোনা মজুদ একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। রুইজাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষে চাষকৃত বদ্ধ পুকুর-দীঘিতে প্রতি দশ শতকে ১০ সেমি আকারের ১ টি ও খোলা বৃহৎ জলাশয়ে ঐ পরিমাণ স্থানে বর্ণিত মাপের ৫টি চিতলের পোনা ছাড়া যেতে পারে।

পোনা প্রাপ্তি ও বাজার চাহিদা

ইদানিং আমাছা নিয়ন্ত্রণ, বাড়তি উৎপাদন বা শখের বশেও অনেকেই জলাশয়ে চিতল মাছের পোনা মজুদ করে থাকেন। এজন্য সাম্প্রতিককালে চিতলের পোনার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আদমদীঘি (বগুড়া), নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, যশোর, ময়মনসিংহ রংপুর ও অন্যান্য স্থানে বিপুল সংখ্যক লোক চিতলের পোনা সংগ্রহ, উৎপাদন ও বিপণনে নিয়োজিত রয়েছে। ২-৩ সেমি হতে ২০-২৫ সেমি আকারের একেকটি পোনা এসব এলাকায় আকার ও মৌসুমভেদে ৩ টাকা - ৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়ে থাকে।

জুন-জুলাই মাসে পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীতে চিতলের পোনা পাওয়া যায়। এছাড়াও ইদানিং অনেক হ্যাচারিতেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে চিতলের পর্যাপ্ত পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। এই মাছ চাষের আপাত: অসুবিধা হলো এটি অন্যান্য চাষকৃত মাছও শিকার করে। সুতরাং একত্র চাষের ক্ষেত্রে এই মাছের মুখের হা- এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের অন্যান্য মাছের পোনা মজুদ করতে হয়। চাষকৃত জলাশয়ে এসব চিতল ১-২ বছরেই ২-৫ কেজি হয় ও আকারভেদে ১৫০-৫০০ টাকা/ কেজি দরে বিক্রি হয়।

উপসংহার

চিতল মাছের চাষ ও উৎপাদন বাংলাদেশে এখনও সৌখিন পর্যায়ে রয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছটির একক ও মিশ্রচাষ সম্ভব। তবে জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে পর্যাপ্ত জীবন্ত প্রাণিজ খাদ্য না থাকলে বাহির হতে তা সরবরাহ করা আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুল। সাধারণভাবে মাছটি বছরে ২-৩ কেজি হয়ে থাকে। মাছটি একান্তভাবেই আমাদের দেশীয় মাছ। পরিবেশ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক জলাশয় সংকোচনের ফলে মাছটি বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির তালিকাভুক্ত। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছটির প্রাপ্যতা আশংকাজনকহারে কমে গিয়েছে। হাট-বাজারেও মাছটি বিরলদৃষ্ট। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা সহজলভ্য করে আমাদের প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছটি পুনঃমজুদ ও বিভিন্ন মাছের চাষ ব্যবস্থাপনায় মাছটির অন্তর্ভুক্তি এর বিলুপ্তি রোধ ও বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি করবে। তবে আমাদের বিভিন্ন চাষ পদ্ধতিতে মাছটি মজুদের সর্বাধিক অনুকূল সংখ্যা, অনুপাত ও আকার এখনও নির্ণেয়। যথাযথ গবেষণা ও মাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি নির্ধারণ করে জনগণকে এবিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। মাছটি বাণিজ্যিকভিত্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত সম্পূরক খাদ্য উদ্ভাবনও এক্ষেত্রে আশু করণীয়।

উন্নতমানের মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও মাছ চাষে উত্তম খাদ্য ব্যবস্হাপনা

মোহাম্মদ জাহের
ড. মোঃ জুলফিকার আলী
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

মাছ চাষের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগত উপকারিতার দিকগুলো আজ সর্বজনস্বীকৃত। লাভজনক ভিত্তিতে মাছের চাষ অর্থাৎ বেশি করে উৎপাদন পেতে হলে উন্নতমানের খাদ্য প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য তেমনি একক বৃহত্তম খরচের বিষয়ও বটে। কিন্তু দেশে বর্তমানে একদিকে খাদ্য উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং অন্যদিকে বানিজ্যিক প্রজাতির মাছের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মৎস্য চাষিরা বিপাকে পড়েছেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাছ চাষকে লাভজনক করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাছের সঠিক পুষ্টি চাহিদার নিরিখে দেশজ উপাদান ব্যবহারে স্বল্পমূল্যের মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও যথাযথ প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মাছ এবং চিংড়ির খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা

মাছের পুষ্টি চাহিদা প্রজাতি, বয়স এবং চাষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। রুই জাতীয় মাছের খাদ্যে আমিষের চাহিদা প্রজাতি ও জীবনস্তর অনুযায়ী ২৫-৩৫% এর মধ্যে থাকে। শিং মাগুর জাতীয় মাছের (পাঙ্গাসসহ) আমিষের চাহিদা প্রজাতি ও জীবনস্তর ভেদে ৩০-৪০%, কৈ মাছের ৩৫-৪৫ এবং চিংড়ির ৩০-৪০% এর মধ্যে থাকে। মাছের যথাযথ পুষ্টি সাধনের জন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় হারে স্নেহ বা তৈল জাতীয় খাদ্য, শর্করা, ভিটামিন এবং খনিজ মিশ্রণ থাকাও প্রয়োজন। প্রজাতি, বয়স ও আকার ভেদে মাছ ও চিংড়ির খাদ্য চাহিদা ভিন্নতর হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ধানী পোনার ক্ষেত্রে দেহ ওজনের ১০-২৫%, আঙ্গুলে পোনার ক্ষেত্রে দেহ ওজনের ৫-১৫% এবং বড় মাছের জন্য দেহ ওজনের ২-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা আবশ্যক।

মাছের খাদ্য উপাদান এবং উৎস

মাছের খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যায় এমন অনেক সম্ভাবনাময় খাদ্য উপাদান আমাদের দেশে সহজেই পাওয়া যায়। মাছের খাদ্য হিসেবে চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, ভূট্টার আটা, সরিষা/ তিলের খৈল সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশে ভাল মানের ফিশমিল পাওয়া যায় না। বাজারে স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত ফিশমিল এবং চেওয়া মাছের শুটকীর গুঁড়া পাওয়া যায়, তা তেমন মানসম্মত নয়। বর্তমানে অনেকেই আমদানীকৃত প্রোটিন কনসেনট্রেট এবং মিট ও বোন মিল মাছের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন দেশ হতে আমদানীকৃত মিট ও বোন মিলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও বিশেষ করে ফাইবারের আধিক্য থাকায় মৎস্য/ চিংড়ি খাদ্যে এদের ব্যবহার শতকরা ২০-২৫ ভাগের বেশি না করাই বাঞ্চনীয়। বেশি ব্যবহার করলে পুকুরের পানিতে শ্যাওলার উৎপাদন বেড়ে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, পুষ্টিমান বজায় রাখার স্বার্থে মৎস্য খাদ্যে উদ্ভিজ খাদ্য উপাদানের সাথে স্বল্প পরিমাণে হলেও এক বা একাধিক প্রাণিজ খাদ্যোপাদান ব্যবহার করা প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাণিজ আমিষের তুলনায় পুষ্টিমান কম হলেও অপ্রচলিত উদ্ভিজ খাদ্যোপাদান যেমন, হেলেঞ্চা, বাঁধাকপি পাতা, ফুলকপি পাতা, মুলাপাতা, ক্ষুদিপানা, অ্যাজোলা ইত্যাদি আমিষের উৎস হিসেবে শুষ্ক অবস্থায় সর্ব্বোচ শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত মৎস্য খাদ্যে ব্যবহার করে খাদ্য তৈরির খরচ কমানো সম্ভব। সুষম খাদ্য তৈরির জন্য খাদ্যের সাথে সাধারণত ০.৫-১.৫% ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয়। তৈরিকৃত খাদ্য পানিতে বেশিক্ষণ স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসেবে চিটাগুড়, আটা বা ময়দা ব্যবহার করা আবশ্যক।

মানসম্মত খাদ্য উপাদান নির্বাচন

খাদ্য তৈরির জন্য এমনসব খাদ্য উপাদান নির্বাচন করতে হবে যেগুলোর গুণগতমান ভাল, সহজে পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা। অবার নির্বাচিত খাদ্য উপাদানে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান আছে কিনা তাও বিবেচনায় আনতে হবে। চালের কুঁড়া তুষমুক্ত ও মানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

অন্যথায় মাছের পরিপাক (digestion) ও পুষ্টি গ্রহণ (absorption) প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। দেশে বর্তমানে প্রাপ্ত মৎস্য খাদ্য উপকরণের মূল্য অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে দেশীয় এবং আমদানীকৃত মৎস্য খাদ্য উপাদানের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নমান ও ভেজাল পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাজারে প্রাপ্ত কিছু কিছু খৈল এর মধ্যে ইদানিং কাঠের গুড়া, ছাই বা ভস্ম, পোড়া মাটির গুড়া, পোড়া মবিল ইত্যাদির ভেজাল মিশ্রণ পাওয়া যাচ্ছে। খাদ্য উপাদান বা খাদ্যের জৈব রাসায়নিক গঠন যেমন- আর্দ্রতা, ভস্ম, আমিষ, স্নেহ, আঁশ, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুষ্টিমান নির্ধারণ করা যায়। খাদ্য তৈরির পূর্বে খাদ্য উপাদানগুলিতে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টিবিরোধী উপাদান আছে কিনা তাও বিবেচনায় আনতে হবে এবং খাদ্য উপাদানের মানের ওপর প্রস্তুতকৃত খাদ্যের মান নির্ভর করে। খাদ্য উপাদানের নিম্নলিখিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে মানসম্মত খাদ্য উপাদান নির্বাচন করা যেতে পারে।

- খাদ্য উপাদানসমূহ স্বাভাবিক রঙের কি না তা নিরূপণ।
- প্রতিটি খাদ্য উপাদানের গন্ধ মূল্যায়ন, যার মাধ্যমে ঐ উপাদান টাটকা কিনা তা বোঝা যায়। পঁচা দুর্গন্ধ বা পোড়া গন্ধ মারাত্মক সমস্যা নির্দেশ করে।
- খাদ্য উপাদান যদি ভেজা বা আঁঠালো থাকে তাহলে বুঝতে হবে খাদ্য উপাদান নিম্ন গুণগত মানসম্পন্ন এবং এতে ছত্রাক জন্মাতে পারে।
- পোকামাকড় কিংবা ছত্রাকের উপস্থিতি খাদ্য উপাদানের গুণগত মানের অবনতি নির্দেশ করে।
- ভাঙ্গা ধাতব পদার্থ, ময়লা এবং অন্যান্য অজৈবিক পদার্থের উপস্থিতি ভেজাল খাদ্যের প্রকৃতি নির্দেশ করে।
- খাদ্যে আঁশের আধিক্য খাদ্যের পরিপাচ্যতা কমিয়ে দেয় এবং নিম্নমান নির্দেশ করে।

তাছাড়া জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুষ্টিমান নির্ণয় করে উপযুক্ত খাদ্য উপাদান নির্বাচন করতে হবে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্য ও মাননিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে আধুনিক মৎস্য চাষ বিস্তার লাভের সাথে সাথে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে ৬০টিরও অধিক প্রতিষ্ঠান মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই পাঙ্গাস, কার্প ও তেলাপিয়ার এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান চিংড়ি, কৈ, মাগুর ও শিং-এর খাদ্য উৎপাদন করে আসছে। প্রজাতিভিত্তিক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ছয় প্রকার খাদ্য যেমন– রেণু পোনার জন্য নার্সারি (পাউডার); বিভিন্ন আকারের পোনার জন্য তিন ধরনের স্টার্টার ১-৩ (ক্র্যাম্বেল/ ফ্ল্যাক); বাড়ন্ত মাছের গ্রোয়ার (পিলেট/ দানাদার); বড় মাছ ধরার পূর্বে ফিনিশার (পিলেট/ দানাদার) বাজারজাত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগই মাছের প্রজাতিভিত্তিক পুষ্টির চাহিদার নিরিখে উৎপাদিত খাদ্যের গুণগতমান এবং খাদ্যে ব্যবহৃত এডিটিবস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, প্যাকিং উপাদান এবং জৈব-নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্তমান বজায় রাখছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন বিপণন করছে। এসকল খাদ্য ব্যবহারে মৎস্য চাষিরা কাঙ্খিত উৎপাদন পাচ্ছে না।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের গুণগতমান নির্ধারণে এর বাহ্যিক অবস্থা ও আকার, জৈব-রাসায়নিক গঠন, পুষ্ঠিমান, ভেজাল দ্রব্য ও পুষ্টি বিরোধী উপাদানের উপস্থিতি, জীবাণু সংক্রমন, নিরাপদ উৎপাদন, প্যাকিং, সংরক্ষণ স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত রুইজাতীয় মাছের খাদ্যে পুষ্টিমান বিশেষ করে আমিষের পরিমাণ বয়স অনুযায়ী ২২-৩০%, তেলাপিয়ার ২৪-২৮%, শিং-মাগুর জাতীয় মাছের (পাঙ্গাসসহ) জন্য ৩০-৪০%, কৈ মাছের জন্য ৩০-৪০ গলদা চিংড়ির জন্য ২৮-৩৫% এবং বাগদা চিংড়ির জন্য ৩৫-৪০% থাকা বাঞ্ছনীয়। উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যে আর্দ্রতা বা পানির পরিমান শতকরা ১০-১২ ভাগের মধ্যে রাখা প্রয়োজন, তার বেশী হলে ফাংগাস বা ছত্রাকজনিত কারণে খাদ্য তাড়াতাড়ি নষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই "মৎস্য ও পশুখাদ্য নীতিমালা, অর্ডিন্যান্স, ২০০৭" জারি করেছে। "মৎস্য ও পশুখাদ্য নীতিমালা, অর্ডিন্যান্স, ২০০৭" অনুযায়ী

রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি যদি খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে তাহলে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নোটিশ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ব্র্যান্ড পরিবর্তন করতে পারবে না। কোন খাদ্যের আইনগত দিকসমূহ (যেমন: প্যাকিং, লেবেলিং, গুণাগুণ) নিশ্চিত না করলে কর্তৃপক্ষ ঐ খাদ্যের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

উৎপাদিত মৎস্য খাদ্যের প্যাকিং এবং লেবেলিং

উৎপাদিত খাদ্য পরিস্কার ও শুকনা অবস্থায় পলিথিন অথবা পলিথিনের লাইনিংসহ পাটের ব্যাগে বা লেমিনেটেড পুরু শক্ত কাগজের ব্যাগে প্যাকিং করা উচিৎ। ব্যাগের মুখ মেশিন দ্বারা বায়ুরোধী করে বন্ধ করতে হবে। প্যাকেটজাত খাদ্য যথাযথভাবে লেবেল করতে হবে। লেবেলিং এর মধ্যে সমস্ত তথ্য যথাঃ কোন প্রজাতির মাছ বা চিংড়ির খাদ্য তার নাম, খাদ্যের ধরণ, খাদ্য উপাদানের তালিকা, বাণিজ্যিক নাম, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পুষ্ঠি উপাদানের প্রফাইল, প্রস্তুতের তারিখ এবং কত তারিখ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে তা উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অব্যশই লেবেলিং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে -

- মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্য ব্যাক্টেরিয়া, এন্টিবায়োটিক এবং বিষাক্ত উপাদান হতে মুক্ত।
- মৎস্য খাদ্য তৈরির সময় কোন ধরনের বৃদ্ধি বর্দ্ধক হরমোন ব্যবহার করা হয়নি।
- লেবেলিং স্পেসিফিকেশন অবশ্যই ব্যাগের ভিতরেও দিতে হবে।

মাঠপর্যায়ে মৎস্য খাদ্য তৈরি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খামারি বা মাছ-চাষিদের সঙ্গতির কথা এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খামারে কার্প/রুইজাতীয় মাছের পোনা ও মিশ্রচাষের এবং মাগুর জাতীয় পাঙ্গাস, শিং, পোনা ও বড় মাছের খামার উপযোগী স্বল্পমূল্যের উন্নতমানের সম্পূরক খাদ্যের মডেল সূত্র সারণি-১ এ দেয়া হলো -

সারণি-১ : রুই/ কার্প এবং পাঙ্গাস/ শিং/ মাগুরজাতীয় পোনা এবং বাড়ন্ত মাছের সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরির মডেল

খাদ্য উপাদান	রুই জাতীয় মাছের খাদ্য		পাঙ্গাস/ শিং/ মাগুর জাতীয় মাছের খাদ্য	
	নার্সারি/ ষ্টার্টার খাদ্য (২৮-৩০% আমিষ)	মিশ্র চাষের খাদ্য (২২-২৪% আমিষ)	নার্সারি/ ষ্টার্টার খাদ্য (৩২-৩৫% আমিষ)	বাড়ন্ত মাছের খাদ্য (২৭-৩০% আমিষ)
ফিশমিল (এ-গ্রেড)	২০.০০	১৫.০০	২৫.০০	২০.০০
মিট ও বোন মিল	১২.০০	৫.০০	২০.০০	১৫.০০
সরিষার/তিলের খৈল	২০.০০	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০
চালের কুঁড়া/গমের ভূষি	৪২.০০	৪৪.৫০	২৫.০০	২৫.০০
ভূট্টার আটা	-	-	১০.০০	২০.০০
চিটাগুড়/ আটা (গম)	৫.০০	১৫.০০	৪.০০	৪.৫০
ভিটামিনওখনিজ মিশ্রণ	১.০০	০.৫০	১.০০	০.৫০
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
খাদ্য রুপান্তরহার(FCR	১.৭৫	২.২৫	১.৫০	২.০০

মিশ্রচাষের খাদ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং মূল্য কমানোর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তিসাপেক্ষে ফিশমিল এবং চালের কুঁড়ার পরিমাণ কমিয়ে ১০-২০% পর্যন্ত সয়াবিন মিল ব্যবহার করা যেতে পারে। ফিশমিলের পরিমাণ ৫% কমিয়ে মিট এন্ড বোনমিলের পরিমাণ ৫% বাড়ানো যেতে পারে। একইভাবে উল্লেখিত খাদ্য উপাদান সহযোগে কৈ-এর পোনা ও বাড়ন্ত মাছের যথাক্রমে ৩৬-৪০% ও ৩০-৩৫% এবং তেলাপিয়ার পোনা ও বাড়ন্ত মাছের যথাক্রমে ২৬% ও ২২% আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে।

বিএফআরআই উদ্ভাবিত খামার উপযোগী স্বল্পমূল্যের পিলেট মেশিন

বিগত ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় মালামাল ব্যবহার করে অগ্রসর চাষিপর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য মাছের দানাদার খাদ্য/ভেজা পিলেট খাদ্য তৈরির প্রথম মেশিন উদ্ভাবন করে এবং ১৯৯৮ সনে আরও উন্নত মডেল উদ্ভাবন করা হয়। আদর্শ সাইজের ১০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন

পিলেট মেশিনটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি ঘন্টায় ১০০-১৫০কেজি। উল্লিখিত সাইজের পিলেট মেশিনটি তৈরিতে ২৫,০০০/= টাকা ব্যয় হয় যা বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে বিএফআরআই সহজ প্রযুক্তিতে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে স্বল্প মূল্যের খামার উপযোগী সেমি-অটো পিলেট মেশিন উদ্ভাবন করে। যা দিয়ে শুস্ক পিলেট বা দানাদার শুস্ক খাবার তৈরি করা যায়। ২০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন সেমি-অটো পিলেট মেশিনটিতে প্রতি ঘন্টায় ১৫০-২০০ কেজি শুস্ক দানাদার বা পিলেট খাদ্য তৈরি করা যায়। যার উৎপাদন খরচ পড়ে ৬০,০০০/= টাকা। ইতোমধ্যে এই পিলেট মেশিন দু'টিই দেশের ছোট-মাঝারি ও বড় মৎস্য চাষিদের কাছে শুস্ক দানাদার খাদ্য তৈরিতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় এবং স্থানীয়ভাবে ময়মনসিংহের বিভিন্ন জায়গায় খামার উপযোগী মৎস্য খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে বর্তমানে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেশীয় প্রযুক্তিতে পিলেট মেশিন তৈরিও বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রস্তুতকৃত খাদ্য সংরক্ষণ

শুকনা পিলেট খাদ্য বায়ুরোধী পলিথিন/চটের বস্তায় অথবা কোন পাত্রে মুখ বন্ধ করে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে সংরক্ষিত পিলেট খাবার পুনরায় রোদে শুকিয়ে রাখা উচিত। গুদাম ঘরে সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য মেঝেতে না রেখে তা পাটাতনের উপরে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে। শুস্ক পিলেট খাবার প্লাস্টিক ব্যাগে বায়ুরোধী অবস্থায় বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য ১-২ মাসের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলা উচিত। তবে খাদ্যে এন্টিফাংগাল এজেন্ট/এন্টি-অক্সিডেন্ট ব্যবহার করলে তা ৩-৪ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। খাদ্য প্রয়োগ হার ও পদ্ধতি সারণি ২ এ প্রদত্ত হলো

সারণি ২: খাদ্য প্রয়োগ হার ও পদ্ধতি বিভিন্ন মাছের খাদ্য প্রয়োগ হার ও পদ্ধতি

খাদ্যের প্রকার	প্রয়োগ হার	প্রয়োগমাত্রা ও সময়	প্রয়োগ পদ্ধতি
পোনা মাছের খাদ্য বা নার্সারী খাদ্য (পাউডার ও সুক্ষ দানাদার খাদ্য)	মাছের দেহের মোট ওজনের ১০-২০%	দৈনিক ৩-৪ বার	পুকুরের চার দিকে ৬-৮টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।
খাবার যোগ্য মাছের খাদ্য শুকনা পিলেট খাদ্য	মাছের দেহের মোট ওজনের ৬-১০% (মাছের গড় ওজন ১০০ গ্রামের নীচে) এবং ২-৫% (মাছের গড় ওজন ১০০ গ্রামের উপরে)	দৈনিক ১-২ বার সকাল ও বিকাল বেলা	পুকুরের চার পাড়ে ৪-৬টি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

- খাবার যোগ্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে ১৫ দিনে/মাসে একবার এবং পোনা মাছ চাষের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে

খাদ্য প্রয়োগ কৌশল অবলম্বনে মাছের উৎপাদন/ খাদ্য খরচ হ্রাসকরণ

মৎস্য খাদ্যের কার্যকারিতা শুধুমাত্র গুণগতমানের উপর নির্ভর করে না, খাদ্য প্রয়োগ কৌশলের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুষ্টিমান সঠিক খাদ্য প্রয়োগ কৌশল অবলম্বন করা না হলে সমৃদ্ধ মৎস্য খাদ্যের কার্যকারিতাও ভাল হয় না। একদিন অন্তর অন্তর যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্ন আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মাছের খাদ্য ও মাছ উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো সম্ভব। এতে মাছের বর্ধন বা উৎপাদন, প্রতিদিন উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য (চাহিদা মাফিক খাদ্যে আমিষ) প্রয়োগের চেয়ে কম হয় না বরং কোন কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন-স্টেশন এবং মাঠপর্যায়ে চাষীদের পুকুরে পাঙ্গাস চাষে দেশীয় খাদ্য উপাদান সহযোগে তৈরি দুটি সম্পূরক খাদ্য, একটি উচ্চ আমিষ (পাঙ্গাসের চাহিদা মাফিক ২৮% আমিষ) সমৃদ্ধ অন্যটি নিম্ন আমিষ (১৪% আমিষ) সমৃদ্ধ খাদ্য যথাক্রমে একদিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করে ছয় মাসের চাষে আয়-ব্যয়ের হিসেবে মোট খাদ্যের শতকরা ২২% আমিষ অর্থাৎ মোট খাদ্য খরচের শতকরা ২৬% অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। কারণ উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্যে পাঙ্গাসের উৎপাদন খরচ নিম্ন আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্যের চেয়ে কেজি প্রতি ৬-৮ টাকা বেশি হয়, ফলে এই পদ্ধতিতে খাদ্য প্রয়োগে প্রথম থেকেই সরাসরি উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের চেয়ে নেট মুনাফা ১.৫ গুণ বেশি পাওয়া গেছে । মাছের উৎপাদনও উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্যের তুলনায় বেশি ছিল।

আহরণ পূর্ববর্তী খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের স্বাদ ও গুণগত মান বজায় রাখা

মাছ আহরণের দিন থেকে ৩০ দিন পূর্ব পর্যন্ত নিম্নোক্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের স্বাদ ও গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব।

- মাছ আহরণের ১৫- ৩০ দিন পূর্বে বাণিজ্যিক গ্রোয়ার জাতীয় মৎস্য খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করে কম প্রাণিজ আমিষ, তৈল ও কম ভিটামিনযুক্ত ফিনিশার জাতীয় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- খাদ্য প্রয়োগ হার পূর্বের তুলনায় অর্ধেক/এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিতে হবে।
- মাছ আহরণের ২৪-৪৮ ঘণ্টা পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।
- পানির গুণাগুণ ঠিক রাখতে হবে। অধিক শ্যাওলা থাকতে পারবে না। শ্যাওলার আধিক্য দেখা দিলে তা দমন করতে হবে। প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন করতে হবে।

আহরণ পরবর্তী সময়ে পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের স্বাদ ও মান বজায় রাখা

মাছ আহরণের পর বারবার মাছকে নলকুপের পরিস্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। পরিস্কার পানি দিয়ে বারবার ধৌত করলে মাছের গায়ের ময়লা ও শরীরের শ্লেষা চলে যাওয়ায় মাছের শরীরের অবাঞ্চিত গন্ধ দূরীভূত হয়, মাছের দেহের রং উজ্জ্বল হয় এবং মাছ বেশিক্ষণ ভাল থাকে। মাছকে তাজা অবস্থায় তাড়াতাড়ি বাজারজাত করতে হবে। এসব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আহরণকৃত মাছের স্বাদ ও মান ভাল থাকবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারমূল্যও বেশি পাওয়া সম্ভব হবে।

উত্তম খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- বাণিজ্যিকভিত্তিতে মাছচাষের জন্য শুকনা পিলেট জাতীয় খাদ্যই সবচেয়ে উপযোগী। এটি পানিতে অধিকতর স্থিতিশীল, অপচয় কম হয়, প্রয়োগ করা সহজ এবং কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগে খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়
- পুকুরের পানির তাপমাত্রা এবং প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে খাদ্য প্রয়োগের হারও বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। শীতকালে খাদ্য প্রয়োগের হার স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়ে আনতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি কমে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এবং পুকুরে শ্যাওলার স্তর পড়লে খাবার প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ রাখতে হবে।
- মাঝে মাঝে খাদ্য প্রয়োগস্থল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রয়োগের যথেষ্ট সময় পরে খাবার থেকে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যের পরিমাণ বেশি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। খাদ্য অবশিষ্ট না থাকলে আস্তে আস্তে প্রয়োগমাত্রা বাড়াতে হবে।
- পানিতে শ্যাওলার পরিমাণ বেড়ে গেলে (ব্লুম হলে) খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে বা বন্ধ রাখতে হবে। শ্যাওলা দমন করে খাদ্য প্রয়োগ আরম্ভ করতে হবে বা প্রয়োগ হার বাড়াতে হবে।

মঙ্গা এলাকার দারিদ্র বিমোচনে খাঁচায় মাছ চাষ

এ. এস. এম. রাশেদুল হক
মৎস অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও রংপুর জেলা মঙ্গা এলাকা নামে চিহ্নিত। প্রমত্তা ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, যমুনা, করতোয়াসহ অনেক ছোট বড় নদ-নদী এসব জেলার বুক ও কোল ঘেঁষে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর বন্যা, নদী ভাঙ্গন, অসময়ে উজানের পানির ঢলে বিস্তৃর্ণ এলাকা বিলীন হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বিশাল বিশাল চর। যা এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীকে করে তুলছে আশ্রয়হীন, কর্মহীন, দুঃস্থ ও অসহায়। মঙ্গা একটি আঞ্চলিক শব্দ। দূর্মূল্য, কাজের অভাবে এলাকার হতদরিদ্র জনগণ যখন খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন ঐ অবস্থাকে বলা হয় মঙ্গা। উত্তর জনপদে আশ্বিন-কার্তিক মাসে শ্রমজীবী অসহায় মানুষগুলো যখন কাজের অভাবে ও প্রকৃতির ভাঙ্গা গড়ার উন্মত্ত খেলায় আশ্রয়হীন হয়ে অনাহারে, অর্ধাহারে দিনযাপন করে তখন ঐ অবস্থাকে বলা হয় কার্তিকের মঙ্গা।

মঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্যাপক হারে নদী ভাঙ্গন, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, চরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পদের অসমবণ্টন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান না থাকায় কর্মসংস্থানের অভাব, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় কর্মবিমুখতা।

এ অঞ্চলের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বিশেষ করে শীত, অনাবৃষ্টি, আর বন্যার ফলে কৃষি নির্ভর। এ জনপদের মানুষগুলো প্রতি বছর ব্যাপক ফসলহীন ও পশুসম্পদের ক্ষতির স্বীকারে পরিণত হয়। এ ছাড়া তিস্তা, ধরলা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া ও বাঙ্গালী নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় প্রতি বছর বন্যা আর নদী ভাঙ্গনের ফলে নদীর তীরবর্তী এলাকার অসহায় মানুষগুলো সহায় সম্বলহীন হয়ে শহরমুখী হচ্ছে আর বাড়ছে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা। মঙ্গা দূরীকরণ ও দারিদ্র বিমোচন একক কোন কর্মসূচি/প্রকল্প বা কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রতিরোধ বা দূর করা সম্ভব নয়। মঙ্গা প্রতিরোধ ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। মাছ চাষের মাধ্যমে মঙ্গা দূরীকরণ ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে অনেক সুফল পাওয়া গিয়েছে। প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ মঙ্গা কবলিত এলাকায় রিভার ইরোসন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৪ সাল থেকে করে কাজ করছে। প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন চাষীদেরকে উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রমটি হতে পারে মঙ্গা এলাকার হত দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার একটি পথ।

খাঁচায় মাছ চাষ

নিয়ন্ত্রিত উপায়ে জাল, বাঁশ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা তৈরি আবদ্ধ খাঁচায় মাছ লালন-পালন করাকেই খাঁচায় মাছ চাষ বলে। মঙ্গা কবলিত এলাকার বিস্তৃর্ণ জলাশয়ে (নদী, খাল ও বিল) খাঁচায় মাছ চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অতি সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে খাঁচা তৈরির মাধ্যমে সহজেই খাঁচায় মাছ চাষ করা যায়। প্রাকৃতিক এসব জলাশয়ে ভূমিহীন, হতদরিদ্র বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাঁচায় দ্রুত বর্ধনশীল জাতের পোনা মাছ দ্বারা (গিফট বা মনোসেক্স তেলাপিয়া, থাই সরপুটি, পাঙ্গাস, কমনকার্প) মাছ চাষের সুযোগ আছে।

জলাশয় নির্বাচন

নদী, খাল, বিল ও মরা নদীর যে সব জায়গায় সারা বছর বা বছরের বেশির ভাগ সময় ১.৫-২ মিটার পানি থাকে সে সব জলা খাঁচায় মাছ চাষের জন্য উত্তম। বসতবাড়ি সংলগ্ন যেখানে পানির রং সবুজ বা প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা আছে এমন জায়গা নির্বাচন করা ভালো। এছাড়া অপেক্ষাকৃত কম স্রোতযুক্ত জলাশয় নির্বাচন করা উত্তম।

খাঁচা তৈরির উপকরণ

এক ঘনমিটার একটি খাঁচা তৈরি করতে পলিথিলিন জাল ৬ মিটার, বড় বাঁশের টুকরা বা বাতা (এক মিটার লম্বা) ১২টি, কর্ড সুতা ৭৫ গ্রাম, নাইলন সুতা ১০০ গ্রাম, পানির বোতলের ফ্লোট (৫ লিটার) ৪টি, ফিডিং ট্রে ১টি ও তাঁরকাটা (১.৫)´ ১০০ গ্রাম। এসব উপকরণ দিয়ে তৈরি প্রতিটি খাঁচার বর্তমান বাজার মূল্য হবে ২৫০-৩০০ টাকা।

জলাশয়ে খাঁচা স্থাপন

জলাশয়ের যে অংশে পানির গভীরতা ১.৫-২ মিটার সেখানে সারিবদ্ধভাবে ৫-১০টি খাঁচা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে খাঁচাগুলো জলাশয়ের তলদেশ থেকে কমপক্ষে ৩০সে:মি: উঁচুতে থাকে এবং খাঁচার উপরিভাগ ১০সে:মি: পানির উপরে ভাসমান থাকে। পোনা মজুদের এক সপ্তাহ আগে বসতবাড়ির কাছাকাছি নিরাপদ জলাশয়ের অংশে খাঁচাগুলো স্থাপন করতে হবে।

খাঁচায় পোনা মাছ মজুদ

দ্রুত বর্ধনশীল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং সহজেই পোনা পাওয়া যায় এমন প্রজাতির (গিফট বা মনোসেক্স তেলাপিয়া বা পাঙ্গাস বা কমনকার্প) প্রতি ঘনমিটার খাঁচায় ৫-৭ সে: মি: আকারের ৩০০টি গিফট তেলাপিয়া বা মনোসেক্স তেলাপিয়া। অথবা প্রতি ঘনমিটার খাঁচায় ১০-১৫ সে: মি: আকারের ১০০-১২৫টি পাঙ্গাস বা কমনকার্প। অথবা প্রতি ঘনমিটার খাঁচায় ৫-৭ সে: মি: আকারের ৩০০টি থাই সরপুটির পোনা মাছ মজুদ করতে হবে।

খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগ ও পরিচর্যা

খাঁচায় অবমুক্ত পোনার দেহের ওজনের ৪-৫% হারে প্রতিদিন সম্পূরক খাদ্য (খৈল, চালের কুঁড়া বা গমের ভূষি) খাঁচায় দিতে হবে (প্রতি কেজি পোনা মাছের জন্য আনুমানিক ৪০-৫০ গ্রাম খাদ্য)। মাঝে মাঝে খাঁচার জাল (কাটা/ ছেড়া) পরীক্ষা করতে হবে। নিয়মিত খাঁচার তলার ফিডিং ট্রে পরিস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজনে খাঁচা স্থানান্তর বা খাঁচাকে ভাসমান জলজ আগাছার সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে। প্রতিদিন সকাল ও বিকাল একই সময়ে খাবার দিতে হবে।

খাঁচায় মাছ চাষের সময়কাল ও মাছ উৎপাদন

প্রতি ৬ মাসে এক ঘনমিটার খাঁচা হতে ২৫-২৭ কেজি মাছ উৎপাদিত হবে, যার বাজার মূল্য ২০০০-২১৬০/- টাকা (প্রতি কেজি মাছের বাজার দর ৮০/- টাকা হিসেবে)।

দশটি খাঁচা হতে ছয় মাসে আয় হবে ২০,০০০/- টাকা। খাঁচা তৈরি, পোনা মাছ ক্রয় ও খাদ্য বাবদ ১০টি খাঁচায় ব্যয় হবে ৭,৫০০/- টাকা। ছয় মাসে নীট লাভ ১২,৫০০/- টাকা। দশটি খাঁচা থেকে বছরে নীট লাভ ২৫,০০০/- টাকা।

দারিদ্র বিমোচন

খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে মঙ্গা এলাকার চরাঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষগুলোর দারিদ্র বিমোচনের অনেক সুযোগ রয়েছে। এনজিও সহায়তায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে মঙ্গা এলাকার এসব হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে খাঁচায় মাছ চাষ একটি মডেল হিসেবে দাড় করানো যেতে পারে। মৎস্য খাত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও শক্তিশালী খাত। উন্মুক্ত জলাশয়গুলো খাঁচায় মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে মঙ্গা এলাকার হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনসহ মাছ উৎপাদনের একটি বিশেষ খাত হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং দেশে মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

(তথ্য সূত্র : খাঁচায় মাছ চাষ ও হাপায় পোনা উৎপাদন, রিভার ইরোসন প্রজেক্ট, প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন, বাংলাদেশ।)

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে খাস জলাশয় ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা

মাসুদ সিদ্দিক
মহসিন কবির
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রাককথা

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত আবহমান কাল হতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের প্রায় ১৩ লক্ষ লোক সার্বক্ষণিক মৎস্যজীবী। এছাড়া প্রায় ১.২০ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের কর্মসংস্থান এবং জীবন জীবিকার জন্য মৎস্য খাতের উপর নির্ভরশীল। আবহমান কাল থেকেই বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি এবং প্লাবনভূমিতে দেশীয় প্রজাতির মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বিরুদ্ধ প্রকৃতি আর মানুষের অপরিণামদর্শিতায় আজ আমরা হারাতে বসেছি এই বিপুল মৎস্য ভাণ্ডার।

দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান। ২০০৬-০৭ সনে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ২৪.৪০ লক্ষ মে. টন যার ১৯.৫২ লক্ষ মে. টন অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুরগুলো উৎপাদন ক্ষমতা নিবিড় চাষ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সরকারি খাস জলাশয়গুলোর উৎপাদন সন্তোষজনকপর্যায়ে এখনও নেয়া সম্ভব হয়নি। দেশের প্রচলিত সরকারি খাস জলাশয় ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং জলজ সম্পদের অবক্ষয় এজন্যে দায়ী। এছাড়া প্রচলিত নীতিমালার কারণে খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষি সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না, ফলে জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবস্থারও নিশ্চিত হয় না।

মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ এর সীমাবদ্ধতা

- যেহেতু সরকারি জলমহালসমূহ রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস সেহেতু আলোচ্য নীতিমালায় রাজস্ব আয় ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে;
- মৎস্যসম্পদসহ জলজ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অস্পষ্ট;
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন দিক নির্দেশনা বা কৌশল দেখানো হয়নি;
- খাস জলমহাল ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা অনুল্লেখ্য;
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রদানকৃত জলাশয়ের ক্ষেত্রে ইজারাদার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার অজুহাতে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনঃইজারা প্রদানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং মামলার দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে সরকার একদিকে যেমন রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে জলাশয়টিতে জৈবিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্ত বায়ন হয় না;
- অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ন্যস্তকৃত জলমহালে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের বিষয়টি স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করা হয় না;
- অধিক মুনাফার আশায় ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ টেকসইপর্যায়ের বাইরে আহরণ করে থাকে। ফলে জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের প্রাকৃতিক নবায়ন (Natural Recruitment) অনিশ্চিত হয়ে পড়ে;
- সর্বোপরি আলোচ্য নীতিমালায় সরকারের দারিদ্র বিমোচন নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়নি।

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ এর প্রস্তাবিত সংশোধন ও পরিমার্জন প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য

- সরকারি জলমহালসহ দেশের সকল অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত হবে;
- মাতৃজলমহাল (Mother Fishery) সংরক্ষণ ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও নবায়ন নিশ্চিত হবে;
- জলমহাল উৎস হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং আদায় নিশ্চিত হবে;
- জলজ পরিবেশ (Aquatic Environment) ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ হবে;
- জলমহাল সম্পদের উপর মৎস্যজীবীসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত হবে এবং এ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের দারিদ্র বিমোচন হবে;
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- স্বল্প মূল্যে আমিষ ও পুষ্টি চহিদা পূরণ হবে;
- সর্বোপরি প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব কি এবং কিভাবে এর বাস্তবায়ন করা যায়

সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব এমন একটি ব্যবস্থা যাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা বা প্রতিনিধি এবং প্রকৃত সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে বেসরকারি উৎস হতে সংশ্লিষ্ট খাতের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করে সরকারিপর্যায়ে তা সমাধান কল্পে উদ্যোগ নেয়া হয়। সামগ্রিক মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। সরকারি খাস জলাশয়ের ইজারা প্রকৃত মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিদের কাছে প্রদানের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। দরিদ্র মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষিদের দূর্বল সামাজিক অবস্থার কারণে সরকারি খাস জলাশয়গুলোর ইজারাপ্রাপ্তিতে তারা সফল হয় না। ইজারা পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব, নিলাম সম্পর্কিত তথ্যাদির অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে খাস জলাশয়গুলো যথাযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে প্রকৃত মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষিরা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করেন তা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সমাধান করা গেলে মৎস্য খাতের উন্নয়ন করা সম্ভবপর হবে। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণ। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব কিভাবে বাস্তবায়ন করে মৎস্য খাতের উন্নয়ন করা যায় তারই একটি উদাহরণ হলো-ফরিদপুর মডেল, যা ক্যাটালিস্ট নামে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রকল্প, স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করে আসছে।

ফরিদপুর মডেল

ক্যাটালিস্ট ফরিদপুর জেলাপর্যায়ে গঠিত জেলা মৎস্য সমিতি (DFA) এর মাধ্যমে তৃণমূলপর্যায়ে মৎস্যজীবী/ প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের সংগঠিত করে সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন করে যা Grassroot level Association (GLA) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। DFA স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের সহায়তায় ইজারা যোগ্য খাস জলাশয় নির্বাচন করে এবং ঐ জলাশয় কেন্দ্রীক GLA এর নিকট ইজারা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসনে উপস্থাপন করে। জেলা পরিষদ কর্তৃক ইজারা প্রাপ্তির পর DFA স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহায়তায় GLA কে উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং তহবিল সংগ্রহের জন্য অর্থায়নকারী সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করে দিয়ে থাকে। অতঃপর DFA যৌক্তিক মূল্যে GLA এর নিকট পোনা বিক্রি করে। তাছাড়া DFA জেলার অভ্যন্তরে কোন অচিহ্নিত জলাশয়ের সন্ধান পেলে তা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার নিকট প্রেরণ করে এবং ইজারা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করে। এ ভাবে প্রথম বছর শেষে (২০০৬) ১২৩ একর জলাভূমি GLA এর বরাবারে ইজারা প্রদান করা হয় এবং এর মাধ্যমে ৩০২ টি পরিবার সুফলভোগি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাপ্ত জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে সুফলভোগি প্রতিটি পরিবার

বাৎসরিক ২১,২০০/- টাকা আয় করতে সমর্থ হয়। এভাবে এখন পর্যন্ত মোট ১২৬৫টি পরিবারকে ৫৩৭.৪৯ একর সরকারি জলা ইজারা প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় GLA এর মাধ্যমে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় এ সকল জলাশয়ে উন্নত মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা গেলে একর প্রতি উৎপাদন ১২৫০ কেজিতে উন্নিত করা যাবে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় তথা মৎস্য অধিদপ্তর ক্যাটালিস্ট কর্তৃক প্রবর্তিত ফরিদপুর মডেলকে সম্প্রসারণ করার উদ্যোগি হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ক্যাটালিস্টের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ কে দিয়ে একটি কেইস স্টাডি সম্পন্ন করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের অনুরূপ মডেলের সাথে ফরিদপুর মডেলের তুলনা করে ভবিষ্যতে খাস জলাশয়গুলোর যথাযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হবে। তাছাড়া সম্প্রতি ফরিদপুর মডেলের ন্যায় অনুরূপ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য উপযোগী জলাশয়ে সম্প্রসারণকল্পে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের সকল জলাশয়ের সর্বশেষ অবস্থা জরীপের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় মৎস্য অধিদপ্তর অদূর ভবিষ্যতে ফরিদপুর মডেলের আদলে অনুরূপ ইজারা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা দেশের অন্যান্য উপযোগি জলাশয়ে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। তবে এ ক্ষেত্রে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৫ সংশোধন ও পরিমার্জন এবং জাতীয় ও আঞ্চলিকপর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার

দেশের সামগ্রিক মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয়ের পাশাপাশি সরকারি খাস জলাভূমির যথাযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য সরকারি খাস জলাশয়গুলো প্রকৃত মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবীদের নিকট দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা দেয়া নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষিরা যে সকল সমস্যা ও বাধার সম্মুখিন হয়ে থাকেন যেমন– শক্তিশালী ইজারা গ্রহীতাগোষ্ঠীর চাপ, প্রকৃত মৎস্যজীবী চিহ্নিতকরণ, উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, তহবিল সংগ্রহের জন্য আর্থিক ঋণ প্রদান এবং সর্বোপরি খাস জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি-সমাধানের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কৌশল মোহনগঞ্জ উপজেলার অর্জিত সফলতা

মোঃ আব্দুল মান্নান মিঞা
মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার পিএইচডি
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

নেত্রকোনা জেলাধীন মোহনগঞ্জ একটি হাওর বিস্তৃত উপজেলা। এ উপজেলায় ২টি হাওর, ৪২টি জলমহাল, ৩০টি বিল, ৫টি নদী, ৯টি খাল ও ২৬৬৪টি পুকুর রয়েছে। এ সকল জলাশয়ের মোট আয়তন ১০,০০০ হেক্টর যা মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অতীতে মোহনগঞ্জের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত বলে উপজেলাটি বৃহৎ মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত ছিল। বর্তমানে পলি ভরাট, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, ধানক্ষেতে অতিরিক্ত রাসায়নিক রাসায়নিক সার ও ব্যাপকভাবে কীটনাশকের ব্যবহারসহ নানাবিধ কারণে মোহনগঞ্জের হাওরগুলোতে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তারপরও জলাশয়-গুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যায়।

জলমহালের প্রকৃতি

উপজেলার বড় হাওরটির নাম 'ডিঙ্গাপোতা হাওর' যার জলায়তন প্রায় ৮০০০ হেক্টর। এ উপজেলার হাওরগুলো মুলত প্লাবনভূমির অনুরূপ বছরে ৭-৮ মাস প্রায় ১০-১২ ফুট পানির নিচে তলিয়ে থাকে। এসময় জলাশয়গুলো দেশীয় প্রজাতির মাছ উৎপাদনের অনুকূল ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়। বর্ষা মৌসুম শেষ হয়ে এলে ডিসেম্বর মাস হতে হাওরসমূহে পানি কমতে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। অন্যদিকে প্রতি বছর এপ্রিল মাস হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত খাল-বিল, নদী-নালা, হাওর ও প্লাবনভূমিসমূহ বর্ষার পানিতে ডুবে থাকে, ফলে এসময় জলাশয়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় প্রজাতির মাছ উৎপাদন হয়। বর্ষা মৌসুমের শুরুতে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে হাওরগুলোতে সব মাছই ডিম ছাড়তে শুরু করে।

এসময় স্থানীয় মৎস্যজীবীরা দেশের অন্যান্য জায়গার ন্যায় এখানেও অতি ছোট ফাঁসের মশারী জাল দ্বারা মাছ ধরা আরম্ভ করে। মশারী জাল ব্যবহারের কারণে অধিকাংশ মাছের পোনা এবং ডিম ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার এটি একটি অন্যতম কারণ। বিগত বছরগুলোতে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় হাওরে অভিযান চালিয়ে ব্যাপক হারে মশারীর জাল আটক করে সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে পোড়ানো হয়। এরপরও পোনামাছ রক্ষা কার্যক্রমে তেমন একটা সফলতা আসেনি। এ সকল পোনামাছ রক্ষা পেলে জলাশয়গুলোতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সর্বসাধারণ তথা মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মোহনগঞ্জ উপজেলায় এবছর ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় না করে কেবলমাত্র স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় মোহনগঞ্জের হাওরগুলোতে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। মোহনগঞ্জ উপজেলার জলাশয়সমূহের অতীত গৌরব উজ্জ্বল দিন ফিরিয়ে আনার জন্য তিনভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জনউদ্বুদ্ধকরণ কমসূচি

যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান আইন শক্তভাবে প্রয়োগ করলে সাময়িক বা আংশিক সমাধান পাওয়া যায় কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সফলতা আনার জন্য প্রয়োজন জনগণকে সচেতন করে তোলা। মাছ সংরক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য মোহনগঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, মৎস্যজীবীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের সহযোগিতায় নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়-

ব্যাপক প্রচারণা

স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় প্রতি জুম'আ বারে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে জুম'আ-র নামাজ আদায়ের এবং জুম'আ-র নামাজ শুরুর পূর্বে মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চলার বা ডিমওয়ালা মাছ এবং পোনামাছ ধরা থেকে বিরত থাকার

সুফল বিষয়ে ইমাম ও মসুল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উপজেলার প্রধান বাজারসহ ইউনিয়ন পর্যায়ের বাজারসমূহে মাইকিংয়ের মাধ্যমে এবং স্থানীয় ডিস চ্যানেলের সহযোগিতায় একইরূপ প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে মত বিনিময়

স্থানীয় মৎস্য আড়তদার ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পোনামাছ ধরা এবং ক্রয় না করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। একইভাবে স্থানীয় জাল ব্যবসায়ীদের সাথেও অনুরূপ মতবিনিময় সভা করে কারেন্ট জাল, মশারী জালসহ নিষিদ্ধ জালগুলো বিক্রি না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। ব্যবসায়ী ছাড়াও রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজ, মৎস্যজীবী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, আনসার ভিডিপি'র সদস্য-সদস্যা, বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষক, গ্রাম পুলিশ, ভিজিএফ, ভিজিডি, বিধবা ভাতা, পঙ্গুভাতা, বয়স্ক ভাতা এবং অন্যান্য সরকারি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সুফলভোগী, সরকারি দপ্তরে এবং এনজিওতে কর্মরত কর্মচারিসহ সকল যুব সংগঠনের কর্মীদের মাঝে ডিমওয়ালা ও ছোটমাছ না ধরার সুফলসহ মৎস্য আইন প্রয়োগের যৌক্তিকতা বিষয়ে আলোচনা সভা করা হয়। দেশপ্রেম, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, বিবেক ও শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করার জন্য Motivation মূলক বক্তৃতামালা ও আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে হাওর এলাকার জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়।

স্থানীয় প্রশাসনের আন্তরিকতার কারণে এসকল জনউদ্বুদ্ধকরণ সভা মোহনগঞ্জের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং মৎস্য সংরক্ষণে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। গত বছর এসব Motivation মূলক কাযক্রম বাস্তবায়নের ফলে মোহনগঞ্জের হাওর এলাকার প্রায় ৫০ হাজার মৎস্যজীবী এবং জনসাধারণ তিন মাস মাছ ধরা থেকে বিরত থাকেন এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

বিদ্যমান মৎস্য আইনের প্রয়োগ

ব্যাপক প্রচার এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের কারণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য তেমন কোন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়নি তবে কেউ যেন আইন ভঙ্গ না করে সেজন্য রাত্রিকালীন টহলের ব্যবস্থা করা হয় এবং টহল ব্যবস্থাকে মনিটরিং করা হয়। সামাজিক অনুশাসন ব্যবস্থাকে জাগ্রত করা হয়। জনগণকে সঠিকভাবে সম্পন্ন উদ্বুদ্ধ হওয়ায় গভীর রাত্রিতে কিংবা নিরব-নিথর-বৃষ্টি মুখর ভোর বেলায়ও একজন ব্যক্তি জাল নিয়ে মাছ ধরতে দেখা যায়নি। এছাড়াও স্থানীয় বাজার এবং হাওরে ব্যবহৃত ক্ষতিকর জাল আটক করে উপজেলা ক্যাম্পাসে এনে পুলিশের উপস্থিতিতে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি জলমহালে স্থায়ী অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা হয় এবং শুষ্ক মৌসুম শুরুর সাথে এলাকার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে জলাশয় খনন করে অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব

উপজেলা প্রশাসনের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাথে, সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতার ঐকমত্য যে কোন কঠিন কাজ বাস্তবায়নকে সহজ করে তুলে তা মোহনগঞ্জে আবারও প্রমাণিত হল। জনগণের মধ্যে আত্মোপলব্ধি সৃষ্টির কারণে তারা মাছ ধরা থেকে বিরত থেকেছে এবং কেউ আইন অমান্য করলে তাকে প্রতিহত করেছে অথবা প্রশাসনকে খবর দিয়েছে। ফলে সরকারের কোন অর্থ ব্যয় বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রয়োজন হয়নি। মোহনগঞ্জের হাওরগুলোয় আগের তুলনায় বড় মাছের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রাপ্যতা বেড়েছে। সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন প্রায় ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে সামষ্টিক স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার

দেশে ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমিসহ মোট ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর প্রাকৃতিক জলাশয় রয়েছে। এ জলাশয়গুলোতে মোহনগঞ্জ উপজেলার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অতি সহজেই দেশ থেকে প্রাণিজ আমিষের অভাব দূর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন, সাময়িক সময়ের জন্য মাছ আহরণ বন্ধ রাখা এবং মাছ ধরা বন্ধ থাকাকালীন সময়ে মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রেখে দেশব্যাপী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করলে দেশীয় মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে এবং মাছের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ হবে। জনগণের খাবারে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে শৈবাল চাষ

ড. মোহাম্মদ জাফর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সামুদ্রিক শৈবাল একটি রপ্তানিযোগ্য পণ্য। বৈদেশিক বাজারে সামুদ্রিক শৈবালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিশ্বে শৈবালের বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ১০ মিলিয়ন টন যার মূল্যমান ১২ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে এ্যাকুয়াকালচার উৎপাদনে শৈবালের অবস্থান দ্বিতীয়। শৈবাল একটি সম্ভাবনাময় জলজ উদ্ভিদ যার পুষ্টিমান অন্যান্য জলজ-প্রজাতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমাদের দেশে সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রায় ১৪০ ধরনের শৈবাল জন্মায়; তাছাড়া প্যারাবন এলাকাতেও ১০ প্রকারের শৈবাল পরিলক্ষিত হয়। দেশে শৈবাল চাষ একটি সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ এবং এর চাষ পদ্ধতি খুবই সহজ। সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে দুইটি প্রজাতি (*Caulerpa racemosa* ও *Hypnea sp.*) স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন চাষপদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত শৈবাল চাষের সূচনা করা হয়। গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় জলরাশিতে শৈবাল চাষ সম্ভব। চাষের কাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণে চাষিদের স্বল্প বিনিয়োগের প্রয়োজন। গৃহস্থালী উপকরণ (যেমন দড়ি, বাঁশ, জাল, প্লাস্টিক বয়া ইত্যাদি) ব্যবহার করে চাষিরা সহজে এই চাষ পদ্ধতি শুরু করতে পারে। জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী স্থানে অধিকাংশ শৈবাল জন্মায় ফলে, ভূমিহীন চাষিগণ খাস সরকারি অনাবাদী জলাভূমিতে বিনা বাধায় চাষ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক বাজারে শৈবালের নিত্য চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এছাড়া চাষকৃত শৈবালের ভালমানের ঔষধি গুণ থাকাতে দেশেও খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে এবং দেশের জনসাধারণ টিউমার, রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগ হতে রক্ষা পাবে।

শৈবাল চাষের প্রয়োজনীয়তা

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মানো শৈবাল বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় জনগণ *Hypnea* শৈবাল কুঁড়িয়ে, তা শুকিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে এবং কিছু শৈবাল সার হিসেবে ব্যবহার করে। পর্যটকদের অবাদে চলাফেরা, নৌ চালনা, পাথর আহরণ ইত্যাদি কারণে সেন্টমার্টিন দ্বীপে শৈবালের আবাসস্থলে কিছুটা বিঘ্ন হচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎস হতে শৈবাল সংগ্রহ না করে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে শৈবাল চাষের মাধ্যমে শৈবাল উৎপাদন করা হয়।

চাষিদের আগ্রহের কারণ

দেশের দ্বীপাঞ্চলের জনগণের জীবিকানির্বাহের মাধ্যম খুবই সীমিত। এতদঅঞ্চলের জনসাধারণকে প্রায় সময় বেকার থাকতে হয়। তারা দৈনিক ভিত্তিতে আয় করে বিধায় তাদের কোন অর্থ সঞ্চিত থাকেনা, ফলে আর্থিক অভাব-অনটন লেগেই থাকে এবং উপায়ন্তর না দেখে ঋণের বোঝা বাড়াতে থাকে। পরিণামে চাষি পল্লীতে পারিবারিক, সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই উপকূলীয় অঞ্চলের চাষিদের প্রয়োজন বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা ও স্থিতিশীল পরিবেশ। চাষিরা যদি শৈবালের ব্যাপক চাষ শুরু করে, অচিরেই তাদের আর্থিক সচ্ছলতাসহ স্থিতিশীল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

শৈবাল চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে অনেকগুলো চাষযোগ্য ও বানিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শৈবাল প্রজাতি রয়েছে, যেমন: *Caulerpa racemosa*, *Hypnea sp.*, *Sargassum* প্রভৃতি। শৈবাল চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। লোকজনের আনাগোনা কম ও পরিষ্কার সমুদ্রের পানিতে খুঁটি বসিয়ে তার দুই প্রান্তে দড়ি আটকিয়ে এবং বাঁশের ফ্রেম বানিয়ে তার মধ্যে জাল লাগিয়ে শৈবাল চাষ করা যায়। দড়ির ফাঁকের মধ্যে শৈবাল টিস্যু নরম সুতা দিয়ে আঁটকিয়ে দিতে হবে যেন পানির স্রোতে ভেসে না যায়।

শৈবাল চাষের জন্য বিষয়সমূহ

- বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি নির্বাচন
- সঠিক স্থান নির্বাচন
- বাঁশের ফ্রেম তৈরির কৌশল
- শৈবাল আহরণের কৌশল
- শৈবাল প্রক্রিয়াজাতকরণের কৌশল

উপসংহার

পল্লী এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দরিদ্রতা। আর্থিক অনটনের কারণে পরিবারের প্রধানগণ ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে না পাঠিয়ে গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত রাখে, যার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ সমাজ তথা দেশের সর্বোপরি শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জক নয়। চাষিরা এই প্রযুক্তি গ্রহণ করে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হতে পারে এবং পরিবারের অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাগণও একাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। শৈবাল চাষ উপকূলীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দেশের জনগণের পুষ্টির অভাব পূরণ ও রোগ প্রতিরোধে শৈবাল একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শৈবাল চাষপদ্ধতির আলোকচিত্র

চাষযোগ্য শৈবাল *Caulerpa racemosa*

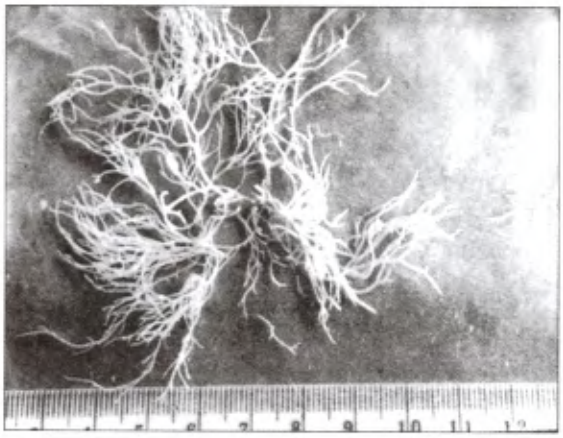

চাষযোগ্য শৈবাল *Hypnea cornuta.*

Hypnea sp. এর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

Caulerpa racemosa এর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০০৬-২০০৭ সালের তথ্যানুযায়ী)

১. অভ্যন্তরীণ মৎস্যের জল আয়তন

ক. বদ্ধ জলাশয়	: ৫,২৮,৩৯০ হেঃ
– পুকুর ও ডোবা	: ৩,০৫,০২৫ হেঃ
– অক্সবো লেক	: ৫,৪৮৮ হেঃ
– চিংড়ি খামার	: ২,১৭,৮৭৭ হেঃ
খ. উন্মুক্ত জলাশয়	: ৪০,৪৭,৩১৬ হেঃ
– নদী ও মোহনা	: ১০,৩১,৫৬৩ হেঃ
– বিল:	১,১৪,১৬১ হেঃ
– কাপ্তাই লেক	: ৬৮,৮০০ হেঃ
– প্লাবন ভূমি	: ২৮,৩২,৭৯২ হেঃ

২. সামুদ্রিক মৎস্যের জল আয়তন

– সমুদ্র সীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	: ২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
– একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	: ৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
– মহী সোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	: ২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
– উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	: ৭১০ কিঃ মিঃ

৩. জেলের সংখ্যা	: ১২.৮০ লক্ষ
– অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	: ৭.৭০ লক্ষ
– সামুদ্রিক জেলে	: ৫.১০ লক্ষ
৪. মৎস্য চাষি	: ৩০.৮০ লক্ষ
– মৎস্য চাষি	: ১৯.৩০ লক্ষ
– চিংড়ি চাষি	: ১১.৫০ লক্ষ
৫. মৎস্য উৎপাদন	: ২৪,৪০,০১১ মে. টন
অভ্যন্তরীণ মৎস্য	: ১৯,৫২,৫৭৩ মে. টন
– উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	: ১০,০৬,৭৬১ মে. টন
– বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	: ৯,৪৫,৮১২ মে. টন
সামুদ্রিক মৎস্য	: ৪,৮৭,৪৩৮ মে. টন
– ট্রলার দ্বারা আহরণ	: ৩৫,৩৯১ মে. টন
– ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	: ৪,৫২,০৪৭ মে. টন

৬. মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি

– পরিমাণ	: ৭৩,৭০৪ টন
– মূল্য	: ৩,৩৫২.৯০ কোটি টাকা
– মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	: ১৩৩ টি (লাইসেন্সকৃত-৭৫,ইইউ অনুমোদিত-৬৫)
– বৈদেশিক মুদ্রায় অবদান	: ৪.৯০%

৭. জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান (২০০৫-২০০৬)

– জিএনপি-তে মাছের মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য)	: ১৬,৩১৬.৮০ কোটি টাকা
– জিডিপিতে অবদান	: ৪.০৭%
– কৃষি খাতে অবদান	: ২২%

৮. মাছ গ্রহণ (Fish Intake) ও চাহিদা

- জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ : ১৬.৬২ কেজি
- মাছের বাৎসরিক চাহিদা : ২৫.৫০ লক্ষ মেঃ টঃ
- জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা : ১৮.০ কেজি
- প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান : ৫৮%

৯. বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি

- মৎস্য হ্যাচারি : ৮৬০ টি
- মৎস্য নার্সারি : ৮,৭১২ টি
- হ্যাচারির রেণু উৎপাদন : ৪,৫৭,২৮৮ কেজি
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেণু সংগ্রহ : ২,০৬১ কেজি
- নার্সারিতে পোনা মাছ উৎপাদন : ৬২,২১০ লক্ষ

১০. বেসরকারি চিংড়ি হ্যাচারি

- বাগদা হ্যাচারি : ৫৭ টি
- বাগদার রেণু উৎপাদন (পিএল) : ৫১,০০০ লক্ষ
- গলদা হ্যাচারি : ৫৩ টি
- গলদার রেণু উৎপাদন (পিএল) : ১০,৮০০ লক্ষ
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি রেণু সংগ্রহ : ১০,০০০ লক্ষ

১১. সরকারি অবকাঠামো (সংখ্যা)

- মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ খামার : ৬ টি
- প্রশিক্ষণ একাডেমী : ১ টি
- মৎস্য হ্যাচারি/মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার : ১১২ টি (হ্যাচারি -৭৭টি)
- হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন : ৬,২৪৪ কেজি
- বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি : ২ টি
- গলদা চিংড়ি হ্যাচারি : ১৭ টি
- চিংড়ির প্রদর্শনী খামার : ২ টি
- চিংড়ির অবতরণ ও সেবা কেন্দ্র : ২০ টি
- মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (বিএফডিসি) : ৯ টি
- মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র/উপকেন্দ্র : ৯ টি

১২. সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)

- ট্রলার : ১২৭ টি
- ইঞ্জিন চালিত নৌকা : ২১,৪৩৩ টি
- বড় অযান্ত্রিক নৌকা : ২২,৫২৭ টি
- সনাতনী নৌকা : ৪৩,৯৬০ টি
- জাল : ২,১৮,৫৮১ টি

১৩. মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)

- মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি : ২৬০ টি
- বিদেশী মৎস্য প্রজাতি : ১২ টি
- মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি : ২৪ টি
- সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি : ৪৭৫ টি
- সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি : ৩৬ টি

১৪. মৎস্য সেক্টরের জনবল

- মৎস্য অধিদপ্তর : মোট : ৪,৫১৮ (প্রথম শ্রেণী : ৯০৩)
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট : মোট : ২৪৬ (প্রথম শ্রেণী : ৭৭)
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন : মোট : ৭৯১ (প্রথম শ্রেণী : ৯৪)

সংকলিত : মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর।

বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন

২০০৬-২০০৭

মৎস্য সেক্টর	জল আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মেঃ টন)	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)	
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়				
(১) মুক্ত জলাশয়				
১. নদী ও মোহনা	১,০৩১,৫৬৩	১৩৬,৯৫৮		১৩৩
২. সুন্দরবন	-	১৭,৭৫১		-
৩. বিল	১১৪,১৬১	৭৫,১৩৭		৬৫৮
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৮,০৮৫		১১৮
৫. প্লাবনভূমি	২,৮৩২,৭৯২	৭৬৮,৮৩০		২৭১
মোট	**৪,০৪৭,৩১৬**	**১,০০৬,৭৬১**	**৪১%**	
(২) বদ্ধ জলাশয়				
১. পুকুর	৩০৫,০২৫	৮১১,৯৫৪		২,৬৬২
২. বাঁওড়	৫,৪৮৮	৪,৬৯৮		৮৫৬
৩. চিংড়ি খামার	২১৭,৮৭৭	১২৯,১৬০		৫৯৩
মোট	**৫২৮,৩৯০**	**৯৪৫,৮১২**	**৩৯%**	
অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মোট)	**৪,৫৭৫,৭০৬**	**১,৯৫২,৫৭৩**	**৮০%**	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়				
১. ট্রলার		৩৫,৩৯১		
২. আর্টিস্যানেল		৪৫২,০৪৭		
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)		৪৮৭,৪৩৮	২০%	
সর্বমোট		**২,৪৪০,০১১**	**১০০%**	

বছরভিত্তিক চিংড়ির উৎপাদন

বছর	উৎপাদন (মেট্রিক টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিস্যানেল	মোট		
১৯৮৬-১৯৮৭	৪২,৮৮২	১৪,৭৭৩	৫৭,৬৫৫	৪,৪৮৮	১০,৬৬৬	১৫,১৫৪	৭২,৮০৯	২০.২৯
১৯৮৭-১৯৮৮	৩৬,৩৮৬	১৭,৮৮৯	৫৪,২৭৫	৩,৫৪৫	১১,৫৩৫	১৫,০৮০	৬৯,৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-১৯৮৯	৪২,৮২৪	১৮,২৩৫	৬১,০৫৯	৪,৮৯৩	১২,২১১	১৭,১০৪	৭৮,১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-১৯৯০	৩৬,২৮৪	১৮,৬২৪	৫৪,৯০৮	৩,১১৭	১২,৭৫১	১৫,৮৬৮	৭০,৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-১৯৯১	৪৩,২৬২	১৯,৪৮৯	৬২,৭৫১	৩,৬৯৬	১৩,৯৩৭	১৭,৬৩৩	৮০,৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-১৯৯২	৬১,০৪২	২০,৩৩৫	৮১,৩৭৭	২,৯০২	১৭,১৪০	২০,০৪২	১০১,৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-১৯৯৩	৭৮,২২৬	২৩,৫৩০	১০১,৭৫৬	৪,১৮৮	১৯,৭৮৭	২৩,৯৭৫	১২৫,৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-১৯৯৪	৫০,৭২১	২৮,৩০২	৭৯,০২৩	৩,৪৭৯	১৮,০৪০	২১,৫১৯	১০০,৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-১৯৯৫	৫৮,৯৭৩	৩৪,০৩০	৯৩,০০৩	২,৪১৬	১৭,৯৪৭	২০,৩৬৩	১১৩,৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-১৯৯৬	৪৪,০৭৯	৪৬,২২৩	৯০,৩০২	৩,৫৮৮	২২,৭৬৫	২৬,৩৫৩	১১৬,৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-১৯৯৭	৪১,৮৬৮	৫২,২৭২	৯৪,১৪০	৩,৫৩৭	২১,২৮১	২৪,৮১৮	১১৮,৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৪৬,৬৩৫	৬২,১৬৭	১০৮,৮০২	২,৪৪৪	২২,৩৪৬	২৪,৭৯০	১৩৩,৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-১৯৯৯	৪৯,২৯৬	৬৩,১৬৪	১১২,৪৬০	৩,৭৬৫	২৭,৯৭৭	৩১,৭৪২	১৪৪,২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-২০০০	৪৩,১৬৭	৬৪,৬৪৭	১০৭,৮১৪	২,৯১৫	২৮,৪৮০	৩১,৩৯৫	১৩৯,২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-২০০১	৪৪,৩৪৩	৬৪,৯৭০	১০৯,৩১৩	৩,১৭২	২৭,৮৬৫	৩১,০৩৭	১৪০,৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-২০০২	৫৪,৯৬৫	৬৫,৫৭৯	১২০,৫৪৪	৩,১৬৮	২৮,৮০৮	৩১,৯৭৬	১৫২,৫২০	৪৩.০০
২০০২-২০০৩	৬০,৮৭৬	৬৬,৭০৩	১২৭,৫৭৯	২,৪৮৬	২৯,৪৪৫	৩১,৯৩১	১৫৯,৫১০	৪১.৮২
২০০৩-২০০৪	৬৩,১০৩	৭৫,১৬৭	১৩৮,২৭০	৩,০৭৫	৩৩,৪১৩	৩৬,৪৮৮	১৭৪,৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-২০০৫	৬৮,৭৬৮	৮২,৬৬১	১৫১,৪২৯	৩,৩১১	৪০,৯৫০	৪৪,২৬১	১৯৫,৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-২০০৬	৭৭,৩৮১	৮৫,৫১০	১৬২,৮৯১	৩,৪৪৪	৪৪,৬৭৫	৪৮,১১৯	২১১,০১০	৪০.৫২
২০০৬-২০০৭	৮২,৪২২	৮৬,৮৪০	১৬৯,২৬২	২,১৭৫	৪৯,৬৯৪	৫১,৮৬৯	২২১,১৩১	৩৯.২৭

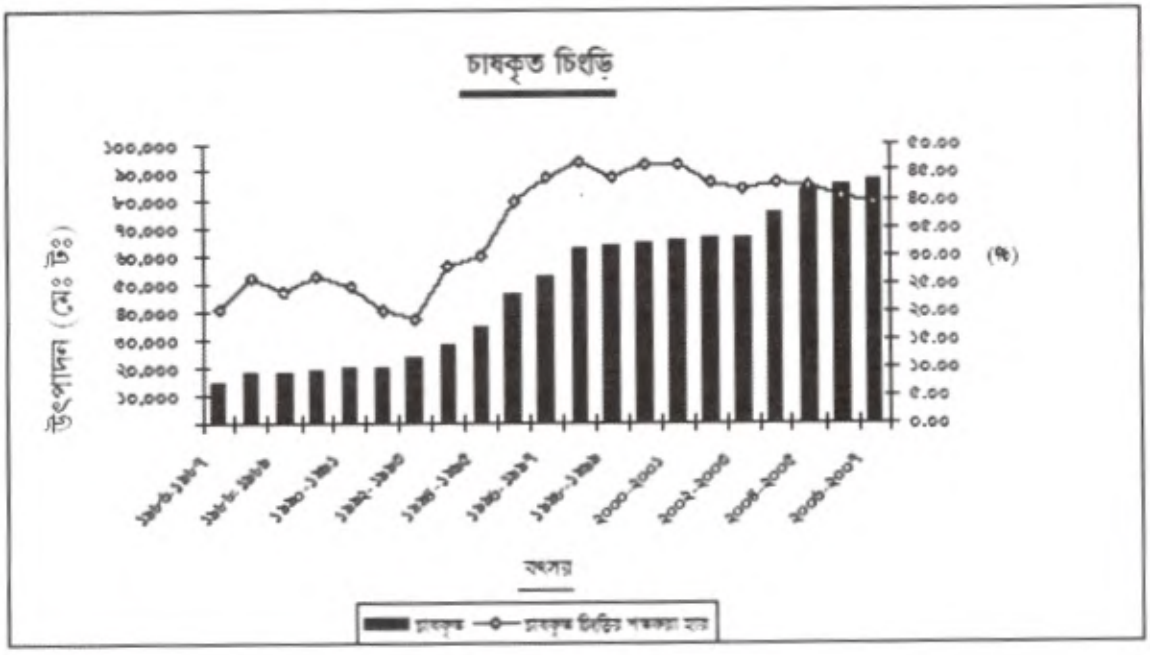

বছর ভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

বছর	ইলিশের উৎপাদন (মেঃ টন)		
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৮,৫৫১	১০৪,৯৫০	১৮৩,৫০১
১৯৮৮-১৯৮৯	৮১,৬৪১	১১০,৩১১	১৯১,৯৫২
১৯৮৯-১৯৯০	১১২,৪০৮	১১৩,৯৪৩	২২৬,৩৫১
১৯৯০-১৯৯১	৬৬,৮০৯	১১৫,৩৫৮	১৮২,১৬৭
১৯৯১-১৯৯২	৬৮,৩৫৬	১২০,১০৬	১৮৮,৪৬২
১৯৯২-১৯৯৩	৭৪,৭১৫	১২৩,১১৫	১৯৭,৮৩০
১৯৯৩-১৯৯৪	৭১,৩৭০	১২১,১৬১	১৯২,৫৩১
১৯৯৪-১৯৯৫	৮৪,৪২০	১২৯,১১৫	২১৩,৫৩৫
১৯৯৫-১৯৯৬	৮০,৬২৫	১২৬,৬৬০	২০৭,২৮৫
১৯৯৬-১৯৯৭	৮৩,২৩০	১৩১,২০৪	২১৪,৪৩৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৮১,৬৩৪	১২৪,১০৫	২০৫,৭৩৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৭৩,৮০৯	১৪০,৭১০	২১৪,৫১৯
১৯৯৯-২০০০	৭৯,১৬৫	১৪০,৩৬৭	২১৯,৫৩২
২০০০-২০০১	৭৫,০৬০	১৫৪,৬৫৪	২২৯,৭১৪
২০০১-২০০২	৬৮,২৫০	১৫২,৩৪৩	২২০,৫৯৩
২০০২-২০০৩	৬২,৯৪৪	১৩৬,০৮৮	১৯৯,০৩২
২০০৩-২০০৪	৭১,০০১	১৮৪,৮৩৮	২৫৫,৮৩৯
২০০৪-২০০৫	৭৭,৪৯৯	১৯৮,৩৬৩	২৭৫,৮৬২
২০০৫-২০০৬	৭৮,২৭৩	১৯৮,৮৫০	২৭৭,১২৩
২০০৬-২০০৭	৮২,৪৪৫	১৯৬,৭৪৪	২৭৯,১৮৯

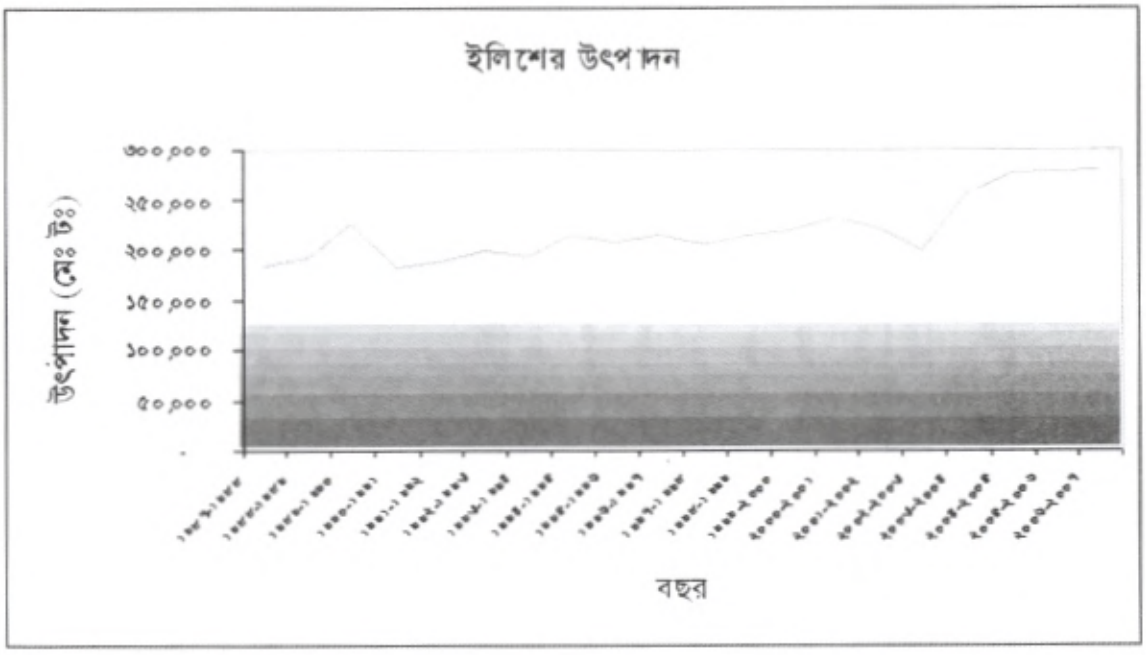

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণ ঃ টন
মূল্য ঃ কোটি টাকা

বছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকী মাছ		লবণাক্ত এবং পানিশূন্য মাছ		কচ্ছপ/কাঁকড়া/ইল		হাঙ্গরের পাখনা এবং মাছের ফোটকা		অন্যান্য		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	(%)
১৯৯২-৯৩	১৯২২৪	৬০৪.০৩	-	-	২৭০৪	৩৮.৩১	১০৪২	১২.২৬	৫৯৯	৯.৮৪	২৮০০	২১.৬০	২৩৮.৩৯	১৪.২৫	-	-	২৬,৬০৭	৭০০.২৯	৭.৫৭
১৯৯৩-৯৪	২২০৫৪	৭৮৭.৭৩	-	-	৩১২৫	৫১.১৮	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫০	১.০৬	৪০৮৮	৩৬.৩৭	৪৫	২.৭৯	-	-	৩১,৮৩৫	৯২০.৯৬	৯.১২
১৯৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭	-	-	৯২৬৭	১৮০.২৬	৫২১	৮.৩৯	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৭৬০	৪০.৬৭	২১২	১৬.৬০	-	-	৪১,৬৮৬	১,৩০৬.৯৪	৯.৩৮
১৯৯৫-৯৬	২৫২২৫	১১০৬.৩৯	-	-	৮৮২৭	১৭৬.৬২	১৮২	৩.০৫	৪৩৬	১১.৪৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৬	৪.২১	-	-	৩৮,৯২৯	১,৩৪০.৯৪	৯.৩৮
১৯৯৬-৯৭	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১	-	-	৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১৩.৮১	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৩	৮.৫৫	-	-	৪১,৫৪৯	১,৪৫৭.৪১	৭.৭৫
১৯৯৭-৯৮	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮	-	-	৮৮৩৬	১৫১.৬৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৯৮	১৪.৩৪	১৫৫	১০.৭৯	-	-	৩০,১৫৮	১,৩৮৭.৮১	৫.৮৩
১৯৯৮-৯৯	২০১২৭	১১৬২.২১	-	-	৬৩৯৫	১৫৩.৯৬	১৩৭	২.২৩	১২৩২	৩৭.১৮	৪৮৬	৬.৩৯	১৫৪	১৭.৪০	-	-	২৮,৫৩১	১,৩৭৯.৩৭	৫.৪১
১৯৯৯-০০	২৮৫১৪	১৬১২.১৫	-	-	৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭	-	-	৩৯,৩৯১	১,৮১১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫	-	-	৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩	-	-	৩৮,৯৮৮	২,০৩২.৭৫	৫.৭৭
২০০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬	-	-	৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭	-	-	৪১,৪৮২	১,৬৩৭.১৪	৪.৭৬
২০০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮	-	-	৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫	-	-	৪৭,৩৭১	১,৯৪১.৫৯	৫.১০
২০০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭	-	-	১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩	-	-	৫৪,১৪১	২,৩৬৩.৪৭	৫.৭১
২০০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯	-	-	১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯	-	-	৬৩,৩৭৭	২,৫৭১.৭২	৫.৯০
২০০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১,১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮,৮২৯	৩,০২৯.৮৪	৪.৫৬
২০০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮	১,১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩,৭০৪	৩,৩৫২.৮৯	৪.৯০

* চিল্ড ফিস্ সংযুক্ত

* রপ্তানিকৃত ইলিশ (চিল্ড) ৩৪৩৩ মেঃ টঃ এবং আয়কৃত মূল্য ৬৪.৮১ কোটি টাকা প্রায় (২০০৬-০৭)।

বছর ভিত্তিক বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন

১৯৯৭-১৯৯৮ থেকে ২০০৬-২০০৭

(একক ঃ মেঃ টন)

মৎস্য সেক্টর	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১,১৯০,৭৬১	১,২৪২,৬২০	১,৩২৭,৫৮৫	১,৪০১,৫৬০	১,৪৭৫,০৩৯	১,৫৬৬,২৮৯	১,৬৪৬,৮১৯	১,৭৪১,৩৬০	১,৮৪৮,৭৩৫	১,৯৫২,৫৭৩
(১) মুক্ত জলাশয়	৬১৫,৯৪৯	৬৪৯,৪১৮	৬৭০,৪৬৫	৬৮৮,৯২০	৬৮৮,৪৩৫	৭০৯,৩৩৩	৭৩২,০৬৭	৮৫৯,২৬৯	৯৫৬,৬৮৬	১,০০৬,৭৬১
১. নদী ও মোহনা	১৫৬,৮৯৪	১৫১,৩০৯	১৫৪,৩৩৫	১৫০,১২৯	১৪৩,৫৯২	১৩৭,৮৪৮	১৩৭,৩৩৭	১৩৯,৭৯৮	১৩৭,৮৫৯	১৩৬,৯৫৮
২. সুন্দরবন	৭,০৩১	১১,১৩৪	১১,৬৪৮	১২,০৩৫	১২,৩৪৫	১৩,৮৮৪	১৫,২৪২	১৫,৭২৪	১৬,৪২৩	১৭,৭৫১
৩. বিল	৬৭,৮১২	৬৯,৮৫০	৭২,৮২৫	৭৪,৫২৭	৭৬,১০১	৭৫,৪৬০	৭৪,৩২৮	৭৪,৯২৫	৭৬,৩৬৫	৭৫,১৩৭
৪. কাপ্তাই লেক	৫,৯৩২	৬,৬৮৯	৬,৮৫২	৭,০৫১	৭,২৪৭	৭,০২৫	৭,২৩৮	৭,৩৭৯	৭,৫৪৮	৮,০৮৫
৫. পাবনভূমি	৩৭৮,২৮০	৪১০,৪৩৬	৪২৪,৮০৫	৪৪৫,১৭৮	৪৪৯,১৫০	৪৭৫,১১৬	৪৯৭,৯২২	৬২১,৪৪৩	৭১৮,৪৯১	৭৬৮,৮৩০
(২) বদ্ধ জলাশয়	৫৭৪,৮১২	৫৯৩,২০২	৬৫৭,১২০	৭১২,৬৪০	৭৮৬,৬০৪	৮৫৬,৯৫৬	৯১৪,৭৫২	৮৮২,০৯১	৮৯২,০৪৯	৯৪৫,৮১২
১. পুকুর	৪৮৩,৪১৬	৪৯৯,৫৯০	৫৬১,০৫০	৬১৫,৮২৫	৬৮৫,১০৭	৭৫২,০৫৪	৭৯৫,৮১০	৭৫৬,৯৯৩	৭৫৯,৬২৮	৮১১,৯৫৪
২. বাঁওড়	৩,৩৭৮	৩,৫৩৬	৩,৬২২	৩,৮০১	৩,৮৯২	৪,০৯৮	৪,২৮২	৪,৩৮৮	৪,৪৯৮	৪,৬৯৮
৩. ঝিঁড়ি খামার	৮৮,০১৮	৯০,০৭৬	৯২,৪৪৮	৯৩,০১৪	৯৭,৬০৫	১০০,৮০৪	১১৪,৬৬০	১২০,৭১০	১২৭,৯২৩	১২৯,১৬০
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	২৭২,৮১৮	৩০৯,৭৯৭	৩৩৩,৭৯৯	৩৭৯,৪৯৭	৪১৫,৪২০	৪৩১,৯০৮	৪৫৫,২০৭	৪৭৪,৫৯৭	৪৭৯,৮১০	৪৮৭,৪৫৮
১. ট্রলার	১৫,২৭৩	১৫,৮১৮	১৬,৩০৪	২৩,৯০১	২৫,১৬৫	২৭,৯৫৪	৩২,৬০৬	৩৪,১১৪	৩৪,০৮৪	৩৫,৩৯১
২. আর্টিস্যানেল	২৫৭,৫৪২	২৯৩,৯৭৯	৩১৭,৪৯৫	৩৫৫,৫৯৬	৩৯০,২৫৫	৪০৩,৯৫৪	৪২২,৬০১	৪৪০,৪৮৩	৪৪৫,৭২৬	৪৫২,০৪৭
সর্বমোট	১,৪৬৩,৫৭৯	১,৫৫২,৪১৭	১,৬৬১,৩৮৪	১,৭৮১,০৫৭	১,৮৯০,৪৫৯	১,৯৯৮,১৯৭	২,১০২,০২৬	২,২১৫,৯৫৭	২,৩২৮,৫৪৫	২,৪৪০,০১১
বছরভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার	৭.৫৮	৬.০৭	৭.০২	৭.২০	৬.১৪	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারজাতকৃত মৎস্য উপকরণ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উপকরণাদির নাম
১.	**ইউনিভেট লিমিটেড** বাড়ী- ১১৩, সড়ক- ১৩, ব্লক -ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩ ফোন-৮৮১১৯৭১,৮৮১৪০৮৭, ৮৮২৯৫৩৭, ৯৮৯৪২৩০ ফ্যাক্স-৮৮৯৮৬৯৭ E-mail: algae@bangla.net	মেজর জিওলাইট, মেজর জিওপাওয়ার, বেস্ট অক্সিজেন, ড্রপার, পি এইচ ও এমোনিয়া টেস্ট কীট বক্স ইত্যাদি
২.	**ফিসটেক (বিডি) লিমিটেড** বাড়ী-২১, রোড- ০১/এ সেক্টর-৫, উত্তরা, ঢাকা -১২৩০ ফোন-৮৯৩২৭১৪, ৮৯৫৯৩১৩ ফ্যাক্স-৮৯৫৯৬৮২ মোবাইল-০১৭১৪০৩৮০০৮, ০১৫৫৪৩২৪২১৫,০১৭১২০৫৯৪১৫	জিওলাইট গোল্ড, এ্যাকুয়া ম্যাজিক, ব্লু-মিক্স, বায়ো-প্রিমিক্স (গোল্ড), বায়োজাইম, অক্সিগোল্ড, গ্যাসোনেক্স, সিউইড, ডেলোটিক্স ইত্যাদি।
৩.	**এ্যাডভান্স এনিমেল সায়েন্স কোং লিঃ** ২/১০ ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ ফোন-৮১৫৮৯৬৫, ৮১৫৮৯৬৭, ৮১৫৮৯৬৮ ফ্যাক্স- ৮১১২১৮৩, ৯১৩৫৩৯৫ E-mail: aasco@bangla.net	Water Quality Test Kits- P^H, O_2, NH_3, NO_2, Cl, Fe, Ca, Hardness, Alkalinity etc. Disinfectants, PCR Laboratory, Feed Ingredients, Shrimple for WSSV etc.
৪.	**নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড** বাড়ী- ৫০, সড়ক- ২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৯ ফোন-৮৫১৫৩০২-০৮, ফ্যাক্স-৮৬১৫৫৪৪ E-mail: sonaton.k.ghosh@gmail.com	জিওটেক্স, অক্সিফ্লো, মেগাভিট এ্যাকুয়া, এ্যাকুয়া বুস্ট, ওক্সিসেপ্টিন ইত্যাদি।
৫.	**প্যাসিফিক ফিস হরমোন প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং কোম্পানী লিঃ** প্রোঃ মোঃ ছাইদুল হক ৫৫/এ (১) কৃষ্টপুর, দৌলতমুন্সী রোড, ময়মনসিংহ ফোন- ৯১ ৬২৯২৫ মোবাইল-০১৭১৩৫১৪৪৬৬	এইচসিজি, কম্পাউন্ড এইচসিজি, এলআরএইচ, এসজিএনআরএইচ, ডম, পিজি, Ovupin-Super, আলফা-মিথাইলটেস্টস্টেরন ইত্যাদি
৬.	**রামা কর্পোরেশন/ফটো হাউজ** প্রঃ এম এ সামাদ ১০৯ পার্করোড, নিউ ডি ও এইচ এম, ঢাকা ফোন-৮৮০ ২ ৮৭১১২১৫ মোবাইল- ০১৭১১৩১৩৬৭৯	এরেটর, এয়ার ব্লোয়ার, এইচসিজি, এলআরএইচ, এসজিএনআরএইচ, ডম ইত্যাদি
৭.	**ইয়ন এনিমেল হেল্‌থ প্রোডাক্ট লিঃ** ৫৩ মহাখালী বা/এ ঢাকা-১২১২ ফোন-৯৮৯৭৮৬৫, ৯৮৬০২৩১	Temsen, Oximax, Mycotoxin binder, Water acidifier etc.
৮.	**এসেনসিয়াল সাইন্টিফিকস** ৩২ শহীদ নজরুল ইসলাম সড়ক, হাটখোলা, ঢাকা-১২০৩ ফোন -৭১৭৫৮২৪, ৭১৬৫১৬৯	পানি পরীক্ষার কীট বক্স ও হ্যাচারির বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ
৯.	**মেসার্স রশিদ পিটুইটারি ইন্ডাষ্ট্রি** পুলেরহাট, বেনাপোল রোড, যশোর ফোন-৪২১ ৬৩৯০৫	PG, HCG, Ovulatory Hormone etc.
১০.	**এসিআই এসিমেল হেথল** এসিআইসেন্টার; ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ফোন-৯৮৮৫৬৯৪ ফ্যাক্স-৮৮০ ২ ৯৮৮৪৭৮৪	মেগাজিও (দানাদার), ভাইরেক্স, ভাইরোফোর, একুরটে গোল্ড (রটেনন), এসিমিক্স সুপারফিস, বায়ো-অক্স ইত্যাদি
১১.	**অর্গানিক ফার্মাসিউক্যিাল লিমিটেড** বাড়ী নং-৫৬, ব্লক নং-ক, পিসি কালচার হাউজিং, শ্যামলী ঢাকা-১২০৭, ফোন- ৮১২৫১৮৫, ৮১২১৭৫৩	বায়ো-টাফ, গ্রীন-টাফ, কুইক অক্সিজেন, ওয়াটার ক্লিয়ার ইত্যাদি
১২.	**নিউট্রিহেলথ লিমিটেড** ৫৬, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ (৭ম তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন	বায়োএ্যাকুয়া লিকুইড
১৩.	**অলটেক বায়োটেকনোলজি (প্রাঃ) লিমিটেড** বাড়ী-৪৬, রবীন্দ্র সরণী, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ফোন-২৮৯৫৫৩৫৫, ৮৯৫৭০৩৭ E-mail: mmamun@alltech.com	মৎস্য খাদ্যের প্রাকৃতিক উপাদান গবেষণা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। মৎস্য চাষে অ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ, বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধে প্রাকৃতিক উপাদান এবং খাদ্যের নিউক্লিওটাইট, ও প্রো-বায়োটিক, ভিটামিন ও মিনারেল।

(বি.দ্র : উল্লিখিত উপকরণসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে বাজারজাত করে থাকে)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

টেলিফোন নির্দেশিকা

নাম ও পদবী	ফোন নং
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	৭১৬৮১৮২ (ফ্যা) ৭১৬১১১৭ (ফ্যা)
জনাব মানিক লাল সমদ্দার মাননীয় স্পেশাল এসিসট্যান্ট	৭১৬২৪৩০ (অ) ৮৮৬১২৯৭ (বা)
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম স্পেশাল এসিসট্যান্টের পিএস	৭১৬৩৯৩০ (অ) ৯১১১৩৩১ (বা)
জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা স্পেশাল এসিসট্যান্টের এপিএস	৭১৬৪৭০২ (অ)
জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান তথ্য অফিসার	৭১৬২৫১৬ (অ) ৮৩৫০৬৯৮ (বা)
জনাব কানাই লাল শীল স্পেশাল এসিসট্যান্টের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬২৪৩০ (অ) ৮৬২৩০২১ (বা)
সৈয়দ আতাউর রহমান সচিব	৭১৬৪৭০০ (অ) ৮৬৫২৮৭৩ (বা)
জনাব জে, আর, শাহরিয়ার সচিবের একান্ত সচিব	৭১৬১২৫৮ (অ) ৯৩৬২৮০৫ (বা)
জনাব মোঃ আবদুর রশিদ যুগ্ম-সচিব (পশুসম্পদ)	৭১৬৬২৬৩ (অ) ৮১২৮৩১৫ (বা)
জনাব পরীক্ষিৎ দত্ত চৌধুরী যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৭১৬১৯৭৭ (অ) ৮৬৫১৭৮৩ (বা)
জনাব মোঃ শাহ আলম সিদ্দিকী যুগ্ম-প্রধান	৭১৬৭৯৬৯ (অ) ৯৩৪২৯৭৯ (বা)
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (প্রঃ)	৭১৬৯৫৬৫ (অ) ৮৩৫০৮০৩ (বা)
জনাব মোঃ আনিসুর রহমান উপ-সচিব (পশুসম্পদ)	৭১৬৯৫৬২ (অ) ৯৬৬৯০৬৫ (বা)
জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম উপ-সচিব (মৎস্য-১)	৭১৬৯৫৬৩ (অ) ৮২৭০৬৫৫ (বা)
জনাব মো: সফিকুল ইসলাম উপ-সচিব (মৎস্য-২)	৭১৬২৭৮৩ (অ) ৯১৩২৮৮২ (বা)
জনাব মোঃ সামসুল হক উপ-সচিব (প্র:-২)	৭১৬৪৬৯১ (অ) ৯১৪৬২১৬ (বা)
জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস উপ-সচিব (মৎস্য-২)	৭১৬১৪০৭ (অ) ৮৬২১২৮০ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ উপ-সচিব (মৎস্য-৩)	৭১৭০০৫২ (অ)
জনাব মোঃ ইমরান উপ-সচিব (মৎস্য-৫)	৭১৭২১৪১ (অ) ৯৩৪৬৫৭০ (বা)
ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন উপ-সচিব (পশুসম্পদ-৩)	৭১৬২২২১ (অ) ৮১১০৭৭১ (বা)
জনাব নিমাই চাঁদ বিশ্বাস উপ-সচিব (প্রঃ-২)	৭১৬৭৩০৬ (অ)
ড. মোঃ শাহজাহান আলী খন্দকার উপ-প্রধান	৭১৬৯৫৬৪ (অ)
মিসেস রুম্মান আখতার খান সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রঃ-১)	৯৫৫১০০৭ (অ) ৯০০২৬৭৩ (বা)
জনাব শাব্বীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-১)	৭১৭২৫৪৫ (অ)
জনাব মইনউদ্দিন আহমদ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)	৭১৬২৭৮৩ (অ)
বেগম জেবুন্নেসা করিম সিনিয়র সহকারী সচিব (পশুসম্পদ-১)	৯৫৬৬৯৪৭ (অ) ৯৩৫৯৮৪০ বা)
জনাব মোঃ আজিজুল হক সহকারী সচিব (প্রঃ-৪)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) ৮৬১১৫৫৪ (বা)
জনাব মোঃ উবায়দুল হক সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য-২ও৩)	৭১৬২১৬৫ (অ) ৯৩৩৫২৫৬ (বা)
বেগম জোবায়দা বেগম সিনিয়র সহকারী প্রধান (মৎস্য-১)	৯৫৫০৩৭১ (অ) ৮৬২২১৯৭ (বা)
জনাব আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান সহকারী প্রধান (মনিটরিং)	৭১৭০১০৮ (অ) ৯০০৫৮৩৪ (বা)
জনাব মোস্তফা কামাল সিনিয়র সহকারী প্রধান (পশুসম্পদ-১)	৭১৬২০৭৬ (অ) ৮৩৫৫৫২৬ (বা)
জনাব ওমর ফারুক সিএও, মপম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	৮৩৫৬২৭৪ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম মহাপরিচালক e-mail: dg@fisheries.gov.bd	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৮০৫৮৯৬৭ (বা) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আবদুল খালেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা e-mail: khalequedofbd@yahoo.com	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৯৫৬১৩৫৫ (ফ্যা)
পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)	৯৫৭১৮১২ (অ)
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬৯৯৪৩ (অ) ৯৩৫৪১০৮ (বা)
উপরিচালক (প্রশাসন)	৯৫৬৭২১৭ (অ)
জনাব মোঃ মাহবুবুল হক উপ-পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (অ) ৯১৩৩২৬৪ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক উপ-পরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ)
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান উপ-পরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬১৫৯২ (অ)
জনাব এ কে বর্মন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯৫৬০৪৫৭ (অ) ৭১১২৯৫৬ (বা)

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬০৬৫৩ (অ)
বেগম আনওয়ারী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৮৩১৩৩৯৩ (বা)
জনাব জোয়ারদার শিবেন্দ্র নাথ উপ-প্রধান (সমন্বয়)	৯৫৬৭২১৬ (অ)
জনাব সুকমল চন্দ সূত্রধর উপ-প্রধান	৯৫৫৪৭১৬ (অ)
জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদির সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৫২১৭৯ (অ) ৯০১৬৩০৬ (বা)
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ)
জনাব এস. এ. শামীম আহমাদ সহকারী পরিচালক (মৎস্য চাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) ৯২০৪৫৪৬ (বা)
জনাব আরিফুর রহমান তরফদার সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	৯৫৬০৪৭২ (অ) ০৮১/৬৬৫৮২ (বা)
বেগম সৈয়দা শিরিন কুলসুমা খাতুন সহকারী পরিচালক (অডিট)	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ)
জনাব মোঃ আতিকুর রহমান সহকারী পরিচালক (লিগাল)	৯৫৫০২৮০ (অ)
জনাব মোঃ আবুল হাশেম সহকারী পরিচালক (সরবরাহ ও সেবা)	৯৫৬৭২১৯ (অ)
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ)
বেগম সালেহা বেগম সহকারী পরিচালক (ডসিয়ার)	৯৫৬৯৩২০ (অ)
জনাব মোঃ আলিমুজ্জামান চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫৪৩ (অ)
বেগম আখতার জাহান চৌধুরী সহকারী প্রধান (বাস্তবায়ন)	৯৫৬৫০২১ (অ)
জনাব মোঃ বছিরুজ্জামান সহকারী প্রধান	৯৫৭১৬৯৮ (অ)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সহকারী প্রধান (সামুদ্রিক)	৯৫৬৫০২৩ (অ)
জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিয়া উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ)	৯৫৬৯২৯৫ (অ)
জনাব বিশ্বজিৎ কুমার দেব মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৭১৬২৮০৪ (অ)
জনাব মোঃ ইউনুস মিয়া প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৫৮৮ (অ)

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

জনাব শাহনওয়াজ মুন্সী পিডি, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার প্রকল্প	৯৫৫০৭৫০ (অ) ৯১১৬৩৫৯ (বা)
জনাব হাবিবুর রহমান খন্দকার পিডি,স্বাদুপানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প	৯৫৬৯৯৪৫ (অ) ৮১২৫৯৯০ (বা)
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন পিডি, এসআইসিডি প্রকল্প	৯৫৬৯০২৬ (অ) ৯৫৫৪৮৬৭ (ফ্যা)
জনাব মোঃ কফিল উদ্দীন কাইয়া এডি, এসআইসিডি প্রকল্প	৯৫৬৯০৪১ (অ) ৮০৩৩৮৬৪ (বা)
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম এনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৮৭১৩৬১৯ (বা)
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন ডিএনপিডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ)
জনাব বদরুল হাসান বাবুল পরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প	৯৫৬১৬৮৫ (অ)
জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান পিডি, আরএফএলডিসি, বরিশাল	০৪৩১/২১৭৬২৯৩ (অ) ০৪৩১/২১৭৬২৯৬(ফ্যা)
ডা. মোঃ আবদুস সোবহান পিডি, আরএফএলডিসি, নোয়াখালী	০৩২১/৬১৮২০ (অ) ০৩২১/৬১৮৬৫ (বা)
জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম ডিপিডি, আরএফএলডিসি, নোয়াখালী	০৩২১/৬১৯৭৪ (অ) ০৩২১/৬২৮০৮ (ফ্যা)
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম পিডি,স্বাদুপানির চিংড়ি চাষ প্রকল্প	৭১৬৭২৬৯ (অ)
ড. মোঃ আবুল হাছানাত পিডি, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ) ৭২১৮০০৫ (বা)
বেগম ফরিদা বেগম পিডি, প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ প্রকল্প	৯৫৬৯৯৩৪ (অ)
বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প, যশোর	৪২১/৬৩১০৮ (অ)

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর

জনাব মোঃ সানাউল্লাহ পরিচালক	০৩১/৭২১৭৩১ (অ)
জনাব মোঃ ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী উপপরিচালক	০৩১/৮১৬৭৮৪ (অ)
জনাব জাফর আহমেদ পিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ	০৩১/৭২৪২০৬ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ

জনাব শরিফুল ইসলাম আকন্দ উপ-পরিচালক, ঢাকা	৭১৬৮৩৮০ (অ)
জনাব মো: আবদুল জলিল উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১/৬৮২৬০৩ (অ)
জনাব আনিছুর রহমান ভূঁইয়া উপ-পরিচালক, খুলনা	০৪১/৭৬০৪৯৫ (অ) ০৪১/৭৬২০৭৩ (বা)
জনাব শেখ সফিকুর রহমান মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা	০৪১/৭৬২০৭৩ (অ) ০৮১/২৮৩০২৮২ (বা)

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক, এফটিএ, সাভার, ঢাকা	৭৭১২৫১৮ (অ) ৮১১৭০৫৭ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল করিম অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১/৬৩৪০২ (অ)
জনাব রমেশ চন্দ্র মন্ডল অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১/৬২৪৫৭ (অ)

জনাব কাজী ইকবাল আজম এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	০৩৮২২/৫৬০৩ (অ) ০৩৮২২/৫৬০৩৯(ফ্যা)
জনাব মোঃ ইসাহাক এফএম, এফটিসি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	০৫৩৩৪/৭৪৩২৪ (অ) ০৫৩৩৪/৭৪৪০২(অ)

পশুসম্পদ অধিদপ্তর

জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ মহাপরিচালক	৮১১৫৫৩২ (অ) ৮৬২৯১৭১ (বা)
ডা. মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন খান পরিচালক (পশুস্বাস্থ ও প্রশাসন)	৯১১৭৭৩৬ (অ)
ডা. শান্তিরঞ্জন দাস পরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১২৩৮৮১ (অ)
জনাব মোঃ নূর ইসলাম পরিচালক (উৎপাদন)	৯১১৭৪৬৮ (অ)

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. জাহাঙ্গীর আলম খান মহাপরিচালক	৭৭০৮৩২৬ (অ) ৭৭০৮০০৬ (বা)

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব মোঃ শাহ আলম পরিকল্পনা সদস্য (কৃষি)	৮১১৫২৪২ (অ) ৮১৫৯২৬৬ (বা)
জনাব মোঃ হামিদুর রহমান বিভাগীয় প্রধান (কৃষি)	৯১১১৭২৫ (অ) ৮৯৫৯২১৭ (বা)
জনাব নুরুল হক মজুমদার যুগ্ম প্রধান (মৎস্য)	৮১১৪৭৩১ (অ) ৮১৪৪০৫৬ (বা)
জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান সহকারী প্রধান (মৎস্য)	৯১১৭০৩৯ (অ)

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা

জনাব আবদুস সোবহান সিকদার সচিব	৮১১৫০২৬ (অ) ৮৬৫১০৭৪ (বা)
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মহাপরিচালক (কৃষি)	৮১১২৭১৩ (অ)
জনাব অমুল্য কুমার দেবনাথ মহাপরিচালক (CPTU)	৯১৪৪২৫২ (অ)
জনাব মোঃ জাহাঙ্গির আলম পরিচালক	৯১৩২৭৫৬ (অ)
জনাব মাসুদুর রহমান বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	৮১১৮১৫৩ (অ)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

জনাব মে. হারুন-উর-রশিদ নির্বাহী চেয়ারম্যান	৮১১৪০৩২ (অ)
ড. খবীর আহমেদ সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৮১১১৪৬৩ (অ) ৭৭১২৪৩৬ (বা)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা

জনাব মোঃ শাহজাহান চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১ (অ) ৯৩৫৫১৫৬ (বা)
জনাব মোশাররেফ হোসেন পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৩৯৭৫ (অ) ৮২৫৪৩৪৭ (বা)
জনাব মোহাম্মদ ইছাক সচিব	৯৫৫২৬৮৯ (অ) ৮০৫৬৮৩০ (বা)
জনাব এম. সফিকুল ইসলাম অর্থ নিয়ন্ত্রক	৯৫৫২০১০ (অ)
জনাব মোঃ আঃ হালিম মল্লিক ব্যবস্থাপক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬১২৭২ (অ)
বেগম খন্দকার লুৎফুননেছা ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)	৯৫৫২০১৪ (অ) ৯৮৮১৩৮৪ (বা)

মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর

জনাব মোঃ আসমাউল হোসেন উপপরিচালক	৭১৬৯৪৫৪ (অ)
জনাব মোঃ রবিউল আউয়াল মন্ডল তথ্য অফিসার	৭১৬৯৪৫৩ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. এম এ মজিদ মহাপরিচালক	০৯১/৬৫৮৭৪ (অ) ০৯১/৫৫৪১০ (বা)
ড. এম জি হোসেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	০৯১/৫৪০১০ (অ) ০৯১/৫৪৩৭৫ (বা)
ড. মোঃ নুরুল্লাহ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৯১/৫৪৬৩১ (অ)
ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ সিএসও, স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	০৯১/৫৪২২১ (অ)
ড. জাহাঙ্গীর আলম পিএসও, লোনা পানি কেন্দ্র, পাইকগাছা	০৪০২৭/৫৬০০৭ (অ)
ড. জি সি হালদার সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১/৬৩৪০৭ (অ)
ড. মোঃ শাহাব উদ্দিন সিএসও, সামুদ্রিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১/৬৩৮৫৫ (অ)

মেরিণ ফিসারিজ একাডেমী

অধ্যক্ষ মেরিণ ফিসারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম	০৩১/৬৩৪৩৭৫ (অ)
মেরিণ ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪ (অ)

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭ (অ)
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন	৮৩১৬৮৮২ (অ) ৮৩১৭৫৩১ (অ)

ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা

বিশ্ব ব্যাংক	৯৬৬৯৩০১-৮
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৯৩৩৪০১৭-২২
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফ এ ও	৮১১৮০১৫-৮
ইউ এন ডি পি	৮১১৮৬০০-০৬
ওয়ার্ল্ড ফিস সেন্টার	৮৮১৩২৫০
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯

আই ইউ সি এন	৯৬৬৪৯৩০
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আই এম এফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৯৩৩৬৭০১-২০
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮

ঢাকা বিভাগ

জনাব মো: আব্দুল মান্নান মিঞা উপপরিচালক	৯৫৫০৮২২ (অ) ৯৫৬৫০২২ (ফ্যা)
জনাব খন্দকার আক্তারুজ্জামান সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২২ (অ)

ঢাকা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯৫৫৮৮৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭১২৫৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২/৭১১৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,কেরানীগঞ্জ	৭৭৬৬৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪/৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৩৮৯৪/৩৮৮০৫১ (অ)

মানিকগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৫১/৬১৩৯১ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৫১/৬১৭৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	০৬৫১/৭৫২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিঙ্গাইর	০৬৫২৭/৮৮০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	০৬৫২৫/৬২০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৬৫১/৭৪১৬৬ (অ)

মুন্সিগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৯১/৬২৫৯১ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৯১/৬৩৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	০৬৯২৫/৮৮০১৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সিরাজদিখান	০৬৯২৪/৮৮০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টঙ্গিবাড়ী	০৬৯২৬/৭৪২৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সিগঞ্জ সদর	০৬৯১/৬২৫৮৩ (অ)

গাজিপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৯২৫২৫২০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	৯২০৫২৪৯ (অ)
সি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫/৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪/৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২/৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ	০৬৮২৩/৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টংগী	৯২৯১৩১৭ (অ)

নরসিংদী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬২৮/৬২৪১০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬২৮/৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০৬২৫৫/৫৬৯৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৮/৭৫০৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০৬২৮/৭৪৪১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলাবো	০৬২৫৫/৬৩১০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩/৫৬১৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	০৬২৮/৬৩০০৬ (অ)

নারায়ণগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৭৬৩০৬২৫ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	৯৭৫০১০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁ	০৬৭২৩/৫৬৩০১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০৬৭২২/৫৬০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০৬৭২৫/৫৬০২৭ (অ)

ফরিদপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৩১/৬৩২২৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১/৬৬৬১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪/৫৬২৮৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১/৬৩৯৯০ (অ)

রাজবাড়ী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৪১/৬৫৫৮৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১/৬৫০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩/৫৬৩৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজবাড়ী সদর	০৬৪১/৬৫৩৬৪ (অ)

মাদারীপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬১/৫৫৪৪২ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৬৬১/৫৫৪১৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২/৫৬১৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩/৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪/৫৬১২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাদারীপুর সদর	০৬৬১/৬২১৬১ (অ)

গোপালগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬৬৮/৫৫৪৫৪ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬৮/৫৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টংগীপাড়া	০৬৬৫৫/৫৬৩৫৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,মোকসেদপুর	০৬৬৫৪/৫৬২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৫৫৫২/৫৬২০৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ সদর	০৬০১/৫৫৬৫৬ (অ)

শরীয়তপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৬০১/৫৫৬৫৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১/৬১৪৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭/৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২/৫৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪/৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩/৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১/৫৯১৪৫ (অ)

ময়মনসিংহ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯১/৫৪৭৪৮ (অ) ০৯১/৬৫৯১৮ (বা)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১/৫২১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪/৫৬০৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০১৭১৮/৭৫৪২৯৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২/৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৯/৫৬০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৮/৭৫৩৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া	০৯০২৩/৭৩০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২/৫৬০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫/৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬/৫৬১৩৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১/৫৪৩৩৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	০৯৭/৫৪১৫৮ (অ)

কিশোরগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৪১/৬১৯২৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১/৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭/৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৬/৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩/৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মিঠামইন	০৯৪৩৫/৫৬০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫/৫৬০২৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ সদর	০৯৪১/৬১৮৬৯ (অ)
হ্যাচারি কর্মকর্তা, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ	০১৮১৭/০০১৩৭৮ (অ)

নেত্রকোনা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৫১/৬১৪০৪ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৫১/৬১৩৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪/৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩/৫৬০৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮/৫৬০০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২/৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২/৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯/৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২/৭৪০৫৫ (অ)

জামালপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৮১/৬৩৬২০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১/৬৩২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪/৭৪১৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩/৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫/৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭/৮৮০৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বকসীগঞ্জ	০৯৮২২/৬৫১৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬/৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১/৬৩৩৫২ (অ)

শেরপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯৩১/৬১৪৪৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ,সদর	০৯৩১/৬২৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৩২৩/৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৩২৪/৭৩৩০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৩২২/৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৩২৫/৫৬০৭৯ (অ)

টাংগাইল জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৯২১/৫৩৬৭৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১/৫৪০৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাপুর	০৯২২৯/৮৮০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩/৭২০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬/৭৫১৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভূঞাপুর	০৯২২৩/৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৭/৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২/৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সখিপুর	০৯২৩২/৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেলদুয়ার	০৯২২৪/৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫/৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮/৫৬০৮৫ (অ)

খুলনা বিভাগ

জনাব জয়দেব কুমার বিশ্বাস উপপরিচালক	০৪১/৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১/৮৬০০১৫ (বা)
মোহাঃ গোলাম রাব্বাণী সহকারী পরিচালক	০৪১/৮৬০৫৮৩ (অ) ০৪১/৮৬০০১৫ (ফ্যা)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খুলনা	০৪১/৮৬১২৮৭ (অ)

খুলনা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১/৭৬৩০১৬ (অ) ০৪১/৭৬০৩৮৩ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯/৫৬০২১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা	০৪০২২/৫৬০২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩/৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫/৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭/৫৬২৬২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬/৫৬০৩৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১/৮৯০০১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১/৮০০১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১/৭০১৪৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খুলনা সদর	০৪১/৮১৩২৫৮ (অ)

সাতক্ষীরা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১/৬৩৩১৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১/৬৩৮৪০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪/৭৫৩২৪ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৩/৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনী	০৪৭২২/৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫/৫৬৩৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬/৭৪০২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২/৭২০৫৫ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭২৫/৫৬১০১ (অ)

বাগেরহাট জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৮/৬২৪৪৫ (অ) ০৪৬৮/৬২১৬১ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮/৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭/৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬/৫৬২০৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মংলা	০৪৬৫৮/৭৩২১৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,কচুয়া	০৪৬৫৪/৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,চিতলমারী	০৪৬৫২/৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোল্লারহাট	০৪৬৫৫/৫৬০২১ (অ)

যশোর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১/৬৫৭৫২ (অ) ০৪২১/৬৮৯৮০ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১/৬৮৯৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অভয়নগর	০৪২২২/৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫/৭১৫২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনিরামপুর	০৪২২৭/৭৮৪২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬/৫৬৩৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩/৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮/৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪/৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১/৬৪০৪৬ (অ)

ঝিনাইদহ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১/৬২৮৫৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১/৬১৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিণাকুণ্ড	০৪৫২২/৭৪০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩/৫৬১০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪/৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫/৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকূপা	০৪৫২৬/৫৬০৬০ (অ)

নড়াইল জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১/৬২০৩৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১/৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগাড়া	০৪৮২৩/৫৬৩৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২/৫৬০৫৪ অ)

মাগুরা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮/৬২৩৪১ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮/৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩/৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪/৫৬১৫২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাগুরা সদর	০৪৮৮/৬২৩১১ (অ)

কুষ্টিয়া জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১/৬২১৮৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১/৫৪১৯৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫/৭৬৪৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪/৩৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬/৫৬৪৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২/৭১৫৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩/৭৫২৬২ (অ)

মেহেরপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১/৬২৫৪৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১/৬২৬৪৩ (অ)

চুয়াডাঙ্গা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১/৬২৩৮৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১/৬৩১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২/৪৭৫০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলমডাঙ্গা	০৭৬২/২৫৬২৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দামুরহুদা	০৭৬২/৩৫৬০৬৭ (অ)

রাজশাহী বিভাগ

জনাব মোঃ শওকত আলী উপপরিচালক	০৭২১/৭৬০১৮৪ (অ)
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক	০৭২১/৮৬০০০২ (অ)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, রাজশাহী	০৭২১/৮৬১৫০১ (অ)

রাজশাহী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১/৭৬০২৪৫ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১/৭৬০৮২৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮/৫৬৩২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুর্গাপুর	০৭২২৪/৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩/৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩/৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২/৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬/৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯/৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫/৫৬১৮১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১/৮৬১৪৪০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পুঠিয়া	০৭২২৮/৫৬৩১৩ (অ)

নাটোর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১/৬২৫৯০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১/৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩/৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪/৭৪৪০৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬/৬৩১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২/৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫/৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১/৬২৯১৮ (অ)

নওগাঁ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১/৬২৫৮৫ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১/৬২৮২৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫/৬২০৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২/৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	০৭৪২৬/৭৫১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭/৫৬০৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩/৫৬০৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২/৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছি	০৭৪২৩/৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুরহাট	০৭৪২৪/৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯/৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১/৬১৭৬১ (অ)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১/৫৫৪৮২ (অ) ০৭৮১/৬২৩৪২ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১/৫৫৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪/৫৬০৩২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩/৭৪১১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫/৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২/৫৬০৪৯ (অ)

পাবনা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১/৬৬০৬৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১/৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬/৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫/৬৪০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘরিয়া	০৭৩২২/৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪/৫৬৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮/৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩/৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঁথিয়া	০৭৩২৭/৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯/৫৬১৬৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬/৬৩৪২৭ (অ)

সিরাজগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১/৬২১৩৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১/৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯/৫৬১৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫/৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭/৬৪৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪/৫৬০২৬ (অ)

লালমনিরহাট জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১/৬১৩৪৬ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১/৬১০২৯ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১/৬১০৭১ (অ)

গাইবান্ধা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১/৬১৬৪৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১/৬১৯২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪/৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬/৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩/৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর	০৫৪১/৬১৩৪৯-৩১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭/৬৪০৭২ (অ)

রংপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১/৬২৯২৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১/৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭/৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫/৮৭০৮১ (অ)

কুড়িগ্রাম জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮১/৬১৫০১ (অ) ০৫৮১/৬১০২৪ (ফ্যা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১/৬১৮৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯/৫৬২৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪/৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫/৫৬০৫১ (অ)

নীলফামারী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১/৬১৫৭০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৫১/৬১৭৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২/৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫/৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩/৭৫১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪/৬৪০৮৩ (অ)

জয়পুরহাট জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১/৬২২২৪ (অ) ০৫৭১/৬৩৪৮৪ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১/৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১/৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩/৫৬০৪৫ (অ)

বগুড়া জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১/৬০৫৭০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১/৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯/৭৭৪১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১/৬৯২২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬/৫৬০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭/৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দি	০৫১/৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪/৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫/৭৫০৮৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর	০৫১/৬৫৩৩৮ (অ)

পঞ্চগড় জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬৮/৬১৩৬৯ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮/৬১৯৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২/৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩/৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৮/৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেতুলিয়া	০৫৬৮/৭৫০৬৩ (অ)

ঠাকুরগাঁও জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১/৫৩৪৬৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১/৫২৫২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৬২২/৫৬০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩/৫৬০১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪/৫৬৩৮৯ (অ)

দিনাজপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১/৬৪৪৮৬ (অ) ০৫৩১/৬১৩৪০ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১/৬৩৩১৫ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩/৭২৫১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪/৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬/৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭/৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯/৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২/৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোড়াঘাট	০৫৩২৮/৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪/৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩/৫৬০২৮ (অ)

চট্টগ্রাম বিভাগ

জনাব মোঃ আলী আজম উপপরিচালক	০৮১/৭৬১২৭ (অ)
জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন সহকারী পরিচালক	০৮১/৭৬৫১১ (অ)

চট্টগ্রাম জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১/৫৮০৯৮২ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫/৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯/৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬/৪৭০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫/৫৬৩৪৮ (অ)

কক্সবাজার জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১/৬৩২৬৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১/৬৪২৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪/৭৪২৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬/৭৫০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫/৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭/৫৬১২০ (অ)
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১/৫১১২৬ (অ)

ফেনী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১/৭৪০৪৬ (অ) ০৩৩১/৬১২৮৭ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১/৭৪০৭৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২/৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪/৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬/৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঁইয়া	০৩৩২৩/৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১/৭৪২৩২ (অ)

চাঁদপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১/৬৩১৬৫ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪১/৬৫৯৮০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫/৫৬১৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭/৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দঃ)	০৮৪২৬/৫৬৩৯০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫/৫৬১৮০ (অ)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১/৫৮৫০১ (অ) ০৮৫১/৫৯৭৮৫ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৫১/৫৯০১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর	০৮৫২৫/৭৫২৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর	০৮৫২৩/৫৬১০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাসিরনগর	০৮৫২৬/৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরাইল	০৮৫২৭/৫৬১৫৫ (অ)

কুমিল্লা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১/৭৬১৫১ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮১/৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯/৫৬১৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮০৩২/৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০/৫৬২১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬/৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩/৫৫৩৩১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাংগালীয়া	০৮১/৭৬৫৪২ (অ)

রাঙ্গামাটি জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১/৬২৩২৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১/৬৩০৬০ (অ)

বান্দরবান জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৬১/৬২৩৩৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১/৬৩০০৫ (অ)

খাগড়াছড়ি জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১/৬১৭২৬ (অ)

লক্ষ্মীপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১/৫৫৪৬৫ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১/৬২২৬৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২৩/৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২২/৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২৪/৭৫৪৯৫ (অ)

নোয়াখালী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩২১/৬১৬৮১ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৩২১/৬১৬৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১/৫২৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানিগঞ্জ	০৩২২৩/৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫/৫৬১৯৭ (অ)

সিলেট বিভাগ

জনাব কাজী আবুল কালাম উপপরিচালক	০৮২১/৭২৩০২৭ (অ) ০৮২১/৮১০৫৩৩ (ফ্যা)
জনাব ছালেহ আহমদ সহকারী পরিচালক	০৮২১/৭২৩২৫৭ (অ)

সিলেট জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১/৭১৬২৪১ (অ) ০৮২১/৮১০৫৪৪ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১/২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২/৫৬১২২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭/৫৬৪২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯/৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮/৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২/৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দঃ সুরমা	০৮২১/২৮৩১৫৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬/৫৬২৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩/৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩/৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪/৫৬০৭০ (অ)
থামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১/২৮৭০২২৫ (অ)
থামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭/৫৬৪২৪ (অ)

সুনামগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১/৫৫৪৯০ (অ) ০৮৭১/৬১৩৯৩ (বা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১/৬১৬৬২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২/৫৭৫০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩/৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭/৫৬০৪২ (অ)

হবিগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১/৫২৫৪০ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৩১/৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮/৫৬৩০২ (অ)

মৌলভীবাজার জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১/৫২৮১৩ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১/৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬/৭১৪৮০ (অ)
থামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৯৬১/৫২২৯২ (অ)

বরিশাল বিভাগ

জনাব মোঃ আবদুল আজিজ উপপরিচালক	০৪৩১/৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১/২১৭৫২৭৭(ফ্যা)
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	০৪৩১/৬৩৪৫২ (অ)

বরিশাল জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১/৬৪০১৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৩১/৬২৬০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝাড়া	০৪৩২৩/৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮/৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯/৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬/৭৫২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪/৫৬০৪১ (অ)

ভোলা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১/৬২৪০৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১/৬২৮৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশন	০৪৯২৩/৭৪০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭/৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪/৫৬১৬৬ (অ)

ঝালকাঠি জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮/৬৩২৫৮ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮/৬৩২০৯ (অ)

বরগুণা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮/৬২৩৯৬ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮/৬২৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২/৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫/৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩/৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪/৫৬১৪৬ (অ)

পটুয়াখালী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১/৬২৫০১ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৪১/৬২০৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া	০৪৪২৫/৩৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২/৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩/৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪/৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬/৭৫২৮৫ (অ)

পিরোজপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১/৬২৫৯৭ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১/৬২৬৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪/৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬/৭৪০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়ীয়া	০৪৬২৫/৭৫১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভান্ডারীয়া	০৪৬২৩/৩৯৭ (অ)
থামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১/৬২০৬৩ (অ)

আমার কৈফিয়ত

মানসম্পন্ন লেখা সত্ত্বেও সীমিত কলেবরে সংকলন প্রকাশ করতে হ'ল বলে অনেকের লেখা অপ্রকাশিত থেকে গেলো। ঐ সকল সম্মানিত লেখকগণের নিকট আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

অল্প সময়ে সংকলন প্রকাশের জন্য ভুলত্রুটি থাকতে পারে। সহৃদয় পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সংকলন প্রকাশের কৃতিত্ব আমার একার নয়-সবার, তবে ব্যর্থতা সবার নয়-আমার। সকল লেখকের সুন্দর আগামী প্রত্যাশায়।

–সম্পাদক